২- সূরা আল-বাকারাহ্
২৮৬ আয়াত, মাদানী

সূরা আল-বাকারাহ্র গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

১) সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা।

২) সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহ্কাম বা বিধি-বিধান সমৃদ্ধ। [ইবনে কাসীর]

৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করেছেনঃ

- আবু উমামাহ্ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর; কেননা, কেয়ামতের দিন এই কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি পুস্প তথা সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন এ দু'টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন এ দু'টি হচ্ছে দু'খণ্ড মেঘমালা, অথবা দু'টুকরো কালো ছায়া, অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। এ দু'টি সূরা যারা তিলাওয়াত করবে তাদের থেকে (জাহান্নামের আযাবকে) প্রতিরোধ করবে। তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত কর। কেননা, এর নিয়মিত তিলাওয়াত হচ্ছে বারাকাহ্ বা সমৃদ্ধি এবং এর তিলাওয়াত বর্জন হচ্ছে আফসোসের কারণ। আর যাদুকররা এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'। [মুসলিম-৮০৪]
- অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৯]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিওনা, নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়'। [মুসলিমঃ ৭৮০] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পড়া হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করেনা। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৮৪]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'প্রত্যেক বস্তুরই উচ্চ স্তম্ভ রয়েছে, কুরআনের সুউচ্চ শৃংগ হলো, সূরা আল-বাকারাহ্'। [তিরমিযীঃ ২৮৭৮, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/২৫৯]

৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে ডাকার সময় বলেছিলেনঃ 'হে সূরা আল-বাকারাহ্র বাহক (জ্ঞানসম্পন্ন) লোকেরা'। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২১৮]

৫) সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত করলে সেখানে ফিরিশ্তাগণ আলোকবর্তিকার মত অবতরণ করে। এ প্রসংগে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [বুখারীঃ ৫০১৮,

মুসলিমঃ ৭৯৬]

৬) যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সূরা আল-বাকারাহ্ জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে আমীর বানাতেন। [তিরমিযী: ২৮৭৬, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ:৩/৫, হাদীস নং ১৫০৯, ৪/১৪০, হাদীস নং ২৫৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৬১১, হাদীস নং ১৬২২]

৭) অনুরূপভাবে যারা সূরা আল-বাকারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান জানতেন, সাহাবাদের নিকট তাদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১২০,১২১]

৮) সর্বোপরি এ সূরাতে আল্লাহ্‌র “ইসমে ‘আযম” রয়েছে যার দ্বারা দো‘আ করলে আল্লাহ্ সাড়া দেন। এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এ আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, যাতে মহান আল্লাহ্ তা‘আলার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহর নামে ।।

الٓمّٓ

১. আলিফ্-লাম-মীম(১),

(১) আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় ‘হরূফে মুকাত্তা‘আত’ বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরূফে মুকাত্তা‘আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। একত্র করলে দাঁড়ায়: نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌّ “প্রাজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ থেকে অকাট্য বাণী যাতে তার কোন গোপন ভেদ রয়েছে”। মূলতঃ এগুলো কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য, যথা- الٓمٓ-حٰمٓ-صٓ । এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা- الف-لام-ميم (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে। কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটি:

১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো।

৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি।

৪) এগুলো ‘মুতাশাবিহাত’ বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী,

তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা'আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশাবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। যেমন আলেমগণ الٓمٓ এ আয়াতটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেনঃ

৫) এখানে আলিফ দ্বারা আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ যা মুখের শেষাংশ থেকে উচ্চারিত হয়, লাম বর্ণটি মুখের মধ্য ভাগ থেকে, আর মীম বর্ণটি মুখের প্রথম থেকে উচ্চারিত হয়, এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে এ কুরআনের শব্দগুলো তোমাদের মুখ থেকেই বের হয়, কিন্তু এগুলোর মত কোন বাক্য আনতে তোমাদের সামর্থ্য নেই।

৬) এগুলো হলো শপথ বাক্য। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দিয়ে শপথ করেছেন।

৭) এগুলো কুরআনের ভূমিকা বা চাবির মত যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনকে শুরু করেন।

৮) এগুলো কুরআনের নামসমূহ হতে একটি নাম।

৯) এগুলো আল্লাহ্র নামসমূহের একটি নাম ।

১০) এখানে আলিফ দ্বারা أَنَا (আমি) আর লাম দ্বারা আল্লাহ্ এবং মীম দ্বারা أَعْلَمُ (আমি বেশী জানি), অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ এর অর্থ বেশী জানি।

১১) আলিফ দ্বারা আল্লাহ্, লাম দ্বারা জিবরীল, আর মীম দ্বারা মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ]

১২) এভাবে এ আয়াতের আরও অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। তবে আলেমগণ এসব আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করলেও এর কোন একটিকেও অকাট্যভাবে এগুলোর অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এগুলো উল্লেখের একমাত্র কারণ আরবদেরকে অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষম ও অপারগ করে দেয়া। কারণ এ বর্ণগুলো তাদের ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালা এবং তারা যা দিয়ে কথা বলে থাকে ও শব্দ তৈরী করে থাকে, তা থেকে নেয়া হয়েছে।

১৩) মোটকথা, এ শব্দ দ্বারা আমরা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারি, যদিও এর মধ্যকার কোন্ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা জানি না। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। অথবা, এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল-সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে এমন কোন কথাও নেই। তাই এর অর্থ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করার অতবেশী প্রয়োজনও নেই।

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

২. এটা[১] সে কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই[২], মুত্তাকীদের

(১) এখানে ذلك শব্দের অর্থ - ঐটা, সাধারণতঃ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ذلك দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছেঃ

১) ذلك শব্দের অর্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝানো হয়েছে, তখন তার অর্থ হবেঃ হে মুহাম্মাদ! (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কিতাব যা আমি তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ করেছিলাম, তা-ই আপনার উপর নাযিল করেছি। অথবা, হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমাদেরকে যে কিতাবের ওয়াদা আমি তোমাদের কিতাবে করেছি সেটা এই কিতাব যা আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল করেছি।

২) এখানে ذلك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ আয়াতসমূহের পূর্বে মক্কা ও মদীনায় নাযিল কুরআনের অন্যান্য সূরা ও আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা। আর যেহেতু সেগুলো আগেই গত হয়েছে, সেহেতু ذلك দ্বারা সম্বোধন শুদ্ধ হয়েছে।

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে কিতাব বলতে ঐ কিতাবকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

৪) এখানে কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ভাল-মন্দ, রিয্‌ক, আয়ূ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫) এখানে ঐ কিতাব বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজে লিখে রেখেছেন তাঁর কাছে আরশের উপর, যেখানে লেখা আছে, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে"। [বুখারীঃ ৭৫৫৩, মুসলিমঃ ২৭৫১]

৬) الم দ্বারা যদি পবিত্র কুরআন বুঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ الم কুরআনের নাম হয়ে থাকে, তাহলে ذلك الكتاب দ্বারা الم বুঝানো হয়েছে।

৭) এখানে ذلك দ্বারা هذا বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ এই কিতাব যার আলোচনা হচ্ছে, বা সামনে আসছে। সুতরাং এর দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ শেষোক্ত মতই সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ। সুতরাং الكتاب দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে।

(২) এ আয়াতে উল্লেখিত ريب শব্দের অর্থ এমন সন্দেহ যা অস্বস্তিকর। এ আয়াতের বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষন করেছেনঃ

১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২) তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহ করো না। [ইবনে কাসীর]

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এর অর্থ তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহে নিপতিত হবে না। অর্থাৎ এর সবকিছু স্পষ্ট।

৪) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ যদি কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ভালমন্দ হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাহলে لا ريب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন নেই।

জন্য[১] হেদায়াত,

৩. যারা গায়েবের[২] প্রতি ঈমান | الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

(১) 'মুত্তাকীন' শব্দটি 'মুত্তাকী'-এর বহুবচন। মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু 'তাকওয়া'। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা। শরী'আতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, বান্দা যেন আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, আর তা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো, তাঁর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়া, এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করা। আর মুত্তাকী হলেন, যিনি আল্লাহ্র আদেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং তাঁর নিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। [ইবনে কাসীর] বর্ণিত আছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? উমর বললেন, কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। উবাই বললেন: এটাই হলো, তাকওয়া। [ইবনে কাসীর]
তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুত্তাকীগণকে কেন হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন? এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন, মূলতঃ মুত্তাকীরাই আল্লাহ্র কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন, অন্যান্য যারা মুত্তাকী নন তারা হেদায়াত লাভ করতে পারেন না। যদিও কুরআন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এ অর্থের উপর প্রমাণবহ। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম তথা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার"। [সূরা আল-ইসরা: ৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ কুরআন তাদের জন্য হিদায়াত যারা হেদায়াত চেনার পর তা গ্রহণ না করার শাস্তির ভয়ে সদা কম্পমান। আর তারা তাঁর কাছ থেকে যা এসেছে তার সত্যায়নের মাধ্যমে রহমতের আশাবাদী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া হিদায়াতের কোন শেষ নেই, মুত্তাকীরা সর্বদা আল্লাহ্র নাযিল করা হেদায়াতের মুখাপেক্ষী বিধায় হেদায়াতকে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আয়াতে কুরআনকে সমস্ত মানবজাতির জন্য হেদায়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে এর অর্থ হলো, হিদায়াতের পথ তাদের দেখাতে পারে যদি তারা তা থেকে হিদায়াত নিতে চায়।

(২) غيب এর অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। কুরআনে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে

আনে(১),	সালাত	কায়েম	وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্‌তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর এ সূরারই শেষে ২৮৫ নং আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

(১) ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোন বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া'। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলতে বুঝায়, কোন বিষয়ে মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কাজে পরিণত করা। এখানে ঈমানের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্তরে অকপট চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। দ্বিতীয়তঃ সে বিষয়ের স্বীকৃতি মুখে দেয়া। তৃতীয়তঃ কর্মকাণ্ডে তার বাস্তাবায়ন করা। শুধু বিশ্বাসের নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইব্‌লিস, ফির'আউন এবং অনেক কাফেরও মনে মনে বিশ্বাস করত। কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। তদ্রূপ শুধু মুখে স্বীকৃতির নামও ঈমান নয়। কারণ মুনাফেকরা মুখে স্বীকৃতি দিত। বরং ঈমান হচ্ছে জানা ও মানার নাম। বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কার্যে পরিণত করা -এ তিনটির সমষ্টির নাম ঈমান। তাছাড়া ঈমান বাড়ে ও কমে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঈমান বিল-গায়েব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

'ঈমান বিল গায়েব' সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গায়েবের বিষয়াদির উপর ঈমান আনার চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারও হতে পারে না। তারপর তিনি এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে জিহাদ করেছি, আমাদের থেকে উত্তম কি কেউ আছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তারা তোমাদের পরে এমন একটি জাতি, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে' [সুনান দারমী: ২/৩০৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৮৫] মূলত: এটি 'ঈমান বিল গায়েব' এর একটি উদাহরণ। সাহাবা, তাবে'য়ীনদের

করে[১] এবং তাদেরকে আমরা যা দান

থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় ঈমান বিল গায়েবের বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরআন। আবার কেউ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ:৯৯] এ সবগুলোই ঈমান বিল গায়েবের উদাহরণ। ঈমানের ছয়টি রুকন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ঈমান বিল গায়েবের মূল অংশ।

(১) 'সালাত'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা বা দো'আ। শরী'আতের পরিভাষায় সে বিশেষ 'ইবাদাত, যা আমাদের নিকট 'নামায' হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমে যতবার সালাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে - সাধারণতঃ 'ইকামত' শব্দের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এ জন্য 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। 'ইকামত' এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি, দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য 'ইকামত' স্থায়ী ও স্থিতিশীল অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। শুধু সালাত আদায় করাকে 'ইকামাতুস সালাত' বলা হয় না। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কুরআনুল কারীমে আছে - 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে'। [সূরা আল-আনকাবূত:৪৫] বস্তুত: সালাতের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা সালাত আদায় করেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। সুতরাং সালাতকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হবে। 'ইক্বামত' অর্থে সালাতে সকল ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। তাছাড়া সময়মত আদায় করা। সালাতের রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত, খুশু, খুযু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবনে কাসীর] ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সকল সালাতের জন্য একই শর্ত। এক কথায় সালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরী'আতের নিয়মানুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্বামতে সালাত। তন্মধ্যে রয়েছে - জামা'আতের মাধ্যমে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। আর তা বাস্তাবায়নের জন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তদারকির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে সালাত কায়েম করাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের অন্যতম কর্ম বলে ঘোষণা

করেছি তা থেকে ব্যয় করে(১)।

৪. আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে(২), আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী(৩)।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

করে বলেনঃ "যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৪১]

(১) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-সদকা প্রভৃতি যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। [তাফসীর তাবারী] কুরআনে সাধারণত 'ইনফাক' নফল দান-সদকার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে গায়েবের উপর ঈমান, এরপর সালাত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) এখানে মুত্তাকীদের এমন আরও কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল গায়েব এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরও একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুমিন ও মুত্তাকী দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, এক শ্রেণী তারা যারা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য শ্রেণী হলেন যারা প্রথমে আহ্‌লে-কিতাব ইয়াহূদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবেন। [দেখুন, বুখারী: ৩০১১, মুসলিম: ১৫৪] প্রথমতঃ কুরআনের প্রতি ঈমান এবং আমলের জন্য, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে, কুরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কুরআন নাযিল হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্‌কাম এবং পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন আমল একমাত্র কুরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

(৩) এ আয়াতে মুত্তাকীগণের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস বা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর

মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারীগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় এ আক্বীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধারূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুস্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা অসামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি কোন আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের দাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যকটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না। প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকারভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাংখা পর্যন্ত এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সংগে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥

৫. তারাই তাদের রব-এর নির্দেশিত হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম(১)।

প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُونَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوقِنُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াক্বীন অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়। যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে। এ দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াক্বীন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬]

মুত্তাকীদের এই গুণ আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরী'আত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরী'আতের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কুরআন যে ইয়াক্বীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াক্বীন থাকতে পারে না। আর সে কুরআনী ইয়াক্বীনই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়াত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

(১) যারা মুত্তাকী তারাই সফলকাম। এখানে মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করার পরে হিদায়াতের জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তারাই তাদের রব-এর দেয়া হিদায়াত পাবে এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ্র এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে। বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতা আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহ্র শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে, সে-ই হচ্ছে সফলকাম। আর সেখানে যে উত্তরোবে না, সে ব্যর্থ।

সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হিদায়াতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হিদায়াতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে

৬. যারা কুফরী[১] করেছে আপনি | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ

বিরুদ্ধাচারণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলিমদের নিকট বলে, আমরা মুসলিম; কুরআনের হিদায়াত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর বা অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলিমদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭নং আয়াতে যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতই মুনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাকারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হিদায়াতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, এর উৎস হচ্ছে তাঁর কিতাব এই কুরআন; অপরদিকে সৃষ্টিজগতকে এ হিদায়াত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছেন, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফেক বলেছেন। কুরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) কাফের শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী, কাফের শব্দটি মুমিন শব্দের বিপরীত। বিভিন্ন কারণে কেউ কাফের হয়, তন্মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের ছয়টি রুকনের কোন একটির প্রতি ঈমান না থাকলে সে নিঃসন্দেহে কাফের। এ ছাড়াও ইসলামের আরকানসমূহও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলেও সে কাফের হবে। অনুরূপভাবে কেউ দ্বীনের এমন কোন আহকামকে অস্বীকার করলেও কাফের বলে বিবেচিত হবে যা দ্বীনের বিধিবিধান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আয়াত ও হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা কুফরীকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। বড় কুফর, ছোট কুফর। **প্রথমতঃ** বড় কুফর। আর তা পাঁচ প্রকারঃ

১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সম্পৃক্ত কুফর। আর তা হল রাসূলগণের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা। অতএব তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাতে যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, সে কুফ্রী করল। এর দলীল হল আল্লাহ্র বাণীঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগমণ হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার

অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাস নয়"? [সূরা আল-'আন্কাবূতঃ ৬৮]

২) অস্বীকার ও অহংকারের মাধ্যমে কুফ্রঃ এটা এভাবে হয় যে, রাসূলের সত্যতা এবং তিনি যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর হুকুম না মানা এবং তাঁর নির্দেশ না শোনা। এর দলীল আল্লাহ্র বাণীঃ "যখন আমরা ফেরেশ্তাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ৩৪]

৩) সংশয়-সন্দেহের কুফ্রঃ আর তা হল রাসূলগণের সত্যতা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে ইতস্তত করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস না রাখা। একে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্রও বলা হয়। আর ধারণা হল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত। এর দলীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করতঃ তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ্ আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের শরীক করি না"। [সূরা আল-কাহ্ফঃ ৩৫-৩৮]

৪) বিমুখ থাকার মাধ্যমে কুফরঃ এদ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ থাকা এমনভাবে যে, স্বীয় কর্ণ, হৃদয় ও জ্ঞান দ্বারা ঐ আদর্শ থেকে দূরে থাকা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। এর দলীল আল্লাহ্র বাণীঃ "কিন্তু যারা কুফ্রী করেছে তারা সে বিষয় থেকে বিমুখ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে"। [সূরা আল-আহকাফঃ ৩]

৫) নিফাকের মাধ্যমে কুফ্রঃ এদ্বারা বিশ্বাসগত নিফাক বুঝানো উদ্দেশ্য, যেমন ঈমানকে প্রকাশ করে গোপনে কুফর লালন করা। এর দলীল আল্লাহ্র বাণীঃ "এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না"। [সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ৩]

দ্বিতীয়তঃ ছোট কুফ্র,

এ ধরনের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না এবং চিরতরে জাহান্নামে অবস্থান করাকেও তা অপরিহার্য করে না। এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। এ প্রকার কুফ্র হল নেয়ামত অস্বীকার করা। কুরআন ও সুন্নার মধ্যে বড় কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না এ রকম যত কুফরের উল্লেখ এসেছে, তার সবই এ প্রকারের অন্তর্গত। এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন

তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন[১], | أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

এমন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে তার প্রচুর জীবিকা আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ্ সে জনপদকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ ১১২] এখানে অনুগ্রহ অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়েছে, যা ছোট কুফর। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাতু]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত 'ইনযার' শব্দের অর্থ, এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। এর বিপরীত শব্দ হলো, 'ইবশার' আর তা এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 'ইনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'ইনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাযীর' বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে 'নাযীর' বলা হয়। কেননা, তারা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, যারা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো আখেরাতে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ আয়াত থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধনের চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কুরআনে কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

তারা ঈমান আনবে না[১]।

৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের শ্রবনশক্তির উপর মোহর করে দিয়েছেন[২], এবং তাদের দৃষ্টির উপর

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক এবং তার অনুসরণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হউক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে এটা জানিয়ে দিলেন যে, ঈমান আনা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। পূর্বে যার জন্য সৌভাগ্য লিখা হয়েছে সেই ঈমান আনবে। আর যার জন্য দূর্ভাগ্য লিখা হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের দ্বারা এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জবাব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সীলমোহর মারার অর্থ হচ্ছে, যখন তারা উপরের বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও কানে সীলমোহর মেরে দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্ম-কাণ্ডই তাদের হৃদয়সমূহকে সীলমোহর মারার উপযুক্ত করে দিয়েছে। আর এ অর্থই কুরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, যথাঃ "কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে"। [সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনঃ ১৪] তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচা আকার ধারণ করেছে। ইমাম তাবারী বলেন, গোনাহ যখন কোন মনের উপর অনবরত আঘাত করতে থাকে তখন সেটা মনকে বন্ধ করে দেয়। আর যখন সেটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটার উপর সীলমোহর ও টিকেট এঁটে দেয়া হয়। ফলে তাতে আর ঈমান ঢোকার কোন পথ পায় না। যেমনিভাবে কুফরী থেকে মুক্তিরও কোন সুযোগ থাকে না। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত 'خَتَمَ' আর অন্য আয়াতে বর্ণিত 'طَبَعَ'। [ত্বাবারী] হাদীসে এসেছে, 'মানুষ যখন কোন একটি গোনাহ্র কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ পড়ার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথম অবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তাওবা না করে, আরও পাপ করতে থাকে, তবে

রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮. আর[১] মানুষের মধ্যে এমন লোকও وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ

পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। [তিরমিযি: ৩৩৩৪, ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেতনা মনের ওপর বেড়াজালের কাজ করে। ফলে তা অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো আস্তরে আবৃত করে দেয়। যে অন্তর ফেতনার প্রভাব অস্বীকার করে, তা অন্তরকে শুভ্র সমুজ্জ্বল করে দেয়। ফলে কোন দিনই ফেতনা তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফেতনা গ্রহণকারী সেই কালো অন্তরটি উপুড় করা কলসের মত ভালো মন্দ চেনার ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে।' [মুসলিম: ২৩১] কাতাদাহ বলেন, তাদের উপর শয়তান ভর করেছে ফলে তারা তার অনুসরণ থেকে পিছপা হয় না। আর একারণেই আল্লাহ্ তাদের অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং তারা হেদায়াত দেখবে না, শুনবে না, বুঝবে না এবং উপলব্ধি করতে পারবে না। [ইবনে কাসীর] যে ব্যক্তি কখনো দাওয়াতী কাজ করেছেন, তিনি অবশ্যই এ সীলমোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টোপথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা তার আর বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে পরবর্তী ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এখানে নিফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

নিফাক অর্থঃ প্রকাশ্যে কল্যান ব্যক্ত করা আর গোপনে অকল্যান পোষণ করা। মুনাফেকী দু'প্রকারঃ ১। বিশ্বাসগত মুনাফেকী। ২। আমলগত (কার্যগত) মুনাফেকী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর] তন্মধ্যে বিশ্বাসগত মোনাফেকী ছয় প্রকার, এর যে কোন একটা কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। ১.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া। ৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের জয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া। আর কার্যগত মুনাফেকীঃ এ ধরণের

رয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি', অথচ তারা মুমিন নয়।

الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ

৯. আল্লাহ্ এবং মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না[১]।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

মুনাফেকী পাঁচ ভাবে হয়ে থাকেঃ এর প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [বুখারীঃ ৩৩, মুসলিমঃ ৫৯] অপর বর্ণনায় এসেছেঃ ঝগড়া করলে অকথ্য গালি দেয়, চুক্তিতে উপনীত হলে তার বিপরীত কাজ করে। [মুসলিমঃ ৫৮, নাসায়ীঃ ৫০২০] এ জাতীয় নিফাক দ্বারা ঈমানহারা হয় না ঠিকই কিন্তু এ জাতীয় নিফাক আকীদাগত নিফাকের মাধ্যম। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হবে এ জাতীয় নিফাক হতে নিজেকে দূরে রাখা। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাত]

(১) উপরোক্ত দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না। এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়ত ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজি করার জন্যই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারও পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হত। মুনাফিকরা ধারণা করত যে, তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও অনুরূপ আয়াত এসেছে, "যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভাল কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৮] সুতরাং তাদের ধারণা যে ভুল তা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন(১)। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী(২)।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শোকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা - এ ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফেকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিনরাত এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিই বটে। তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সবসময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। "আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন"-এর অর্থ এই যে, তারা যেহেতু তাদের অন্তরকে ব্যাধি দিয়ে কলুষিত করেছে সেহেতু তাদের এ কলুষতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এখানে মূলতঃ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কারও উপর যুলুম করেন না। কেউ খারাপ পথে চলতে না চাইলে তাকে সে পথে জোর করে চলতে বাধ্য করেন না। এ কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, সূরা আল-মায়েদার ৪৯, সূরা আল-আন'আমের ১১০, সূরা আত-তাওবাহর ১২৫, সূরা আস্-সফ্ফ -এর ৫নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডের কারণেই তাদের পরিণতি খারাপ হয়েছে। আর হিদায়াতও নসীব হয়নি।

(২) মুনাফিকদের এমন দু'টি চরিত্র ছিল যে, তারা নিজেরা মিথ্যা বলত, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলত। [ইবনে কাসীর] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে বলেছে, "মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'(১), তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'(২)।

বিরত থাক"। [সূরা আল-হাজ্জ:৩০] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা ঈমান দূর করে"। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৫]

(১) আবুল আলীয়া বলেন, 'ফাসাদ সৃষ্টি করো না' অর্থাৎ যমীনে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ো না। মুনাফিকদের ফাসাদ সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে, যমীনের বুকে আল্লাহ্র নাফরমানী ও অবাধ্যতা অবলম্বন। কেননা, যে কেউ যমীনে আল্লাহ্র অবাধ্য হবে, অথবা অবাধ্যতার নির্দেশ দিবে সে অবশ্যই যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করল। কারণ, আসমান ও যমীন একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) যেহেতু মুমিনদেরকে মুনাফিকদের মৌখিক ঈমান ধোঁকায় ফেলে, অতএব নিফাকের ফাসাদ সুস্পষ্ট। কেননা, তারা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলে মুমিনদেরকে ভুলিয়ে রাখে এবং মুমিনদের অভ্যন্তরীন কথা নিয়ে কাফের বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তারা এ ফাসাদকে মীমাংসা মনে করছে। তারা মনে করছে, আমরা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোস ও শান্তি বজায় রাখতে পারি। তারা মনে করছে, তারা মুমিন ও আহলে কিতাবদের মধ্যে আপোস-রফা চালাচ্ছে। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, মনে রেখ তারা যেটাকে আপোস বা মীমাংসা মনে করছে সেটাই আসলে ফাসাদের মূল সূত্র। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে সেটাকে ফাসাদ হিসেবেই মনে করছে না। [ইবনে কাসীর] মূলত: মুনাফিকদের স্থায়ী কোন নীতি নেই। সুযোগ বুঝে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুনাফিকের উদাহরণ হলো ঐ ছাগীর ন্যায় যা দু' পাল পাঁঠা ছাগলের মাঝখানে অবস্থান করে। জৈবিক তাড়নায় সে উভয় পালের পাঁঠাদের কাছেই যাতায়াত করে। সে বুঝতে পারে না কার অনুসরণ করা দরকার।" [মুসলিম:২৭৮৪] মোটকথা: মুনাফিক ব্যক্তিত্বহীন। মহান আল্লাহ্ মুনাফিকদের এ চরিত্রের কথা ঘোষণা করে বলেন, "তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে!" [সূরা আন-নিসা: ১৪৩] কাতাদাহ বলেন, মুনাফিকের চরিত্র সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে, তাদের সবচেয়ে খারাপ চরিত্র হচ্ছে, তারা মুখে যা বলে অন্তরে তা অস্বীকার করে। আর কর্মকাণ্ডে তার বিপরীত করে। এক অবস্থায় সকালে উপনীত হয় তো অন্য অবস্থায় তার সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা যে অবস্থায় হবে, সকাল হবে তার বিপরীত অবস্থায়। নৌকার মত নড়তে থাকে, যখনই কোন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয়, সে বাতাসের সাথে নিজেকে প্রবাহিত করে। [আত-তাফসীরুসসহীহ]

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

১২. সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না(১)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে'(২), তারা বলে, 'নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো(৩)?' সাবধান!

(১) মুনাফিকরা ফেৎনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কুরআন পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজি নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

(২) এ আয়াতে মুনাফেকদের সামনে সত্যিকারের ঈমানের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, 'অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন'। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নাযিলের যুগে তারাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের সমষ্টিগত ঈমানই ঈমানের কষ্টিপাথর। তাদের অনুসরণ করেই পরবর্তীরা ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন। সাহাবাদের ঈমানের মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহ, ফেরেশ্তা, কিতাব, রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। সুতরাং তাদের মত ঈমানই সবার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(৩) সে যুগের মুনাফেকরা সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারনতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত

নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'(১), আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের(২) সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন(৩),

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

সেটা বুঝতেই পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বড় বোকা। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে মুনাফেকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলিম হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের মুনাফিক কিংবা কাফের-মুশরিক ও আহলে কিতাব অথবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলিমদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে বোকা বানাবার জন্য মিশেছি। [ইবনে কাসীর]

(২) আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জ্বিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে শায়াতীন বলতে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সর্দাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বদলা নেয়ার জন্য তাদের সাথে উপহাস করেছেন'। কাফেরদের ঠাট্টা বা উপহাসের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাদের সাথে উপহাস বা ঠাট্টা করা দোষণীয় কিছু নয়। বরং এটা আল্লাহ্‌র এমন এক কর্মবাচক গুণ যা হওয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করার দিক থেকে বিভিন্ন গুণাগুণ চার প্রকারঃ

১) এমন কিছু গুণ রয়েছে, যেগুলো গুণ হিসেবে পরিপূর্ণ ও উত্তম তবে কখনো কখনো এগুলো থেকে মন্দ অর্থও বুঝা যায়। এরূপ গুণসমূহ থেকে আল্লাহ্‌র নাম

يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে(১)। কাজেই

গ্রহণ করা যাবে না। বরং গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, 'কালামুল্লাহ্' (আল্লাহ্র কথাবার্তা), 'ইরাদা' (আল্লাহ্র ইচ্ছা) এগুলো আল্লাহ্র গুণ হিসেবে ব্যবহার হবে অর্থাৎ গুণ হিসেবে তাঁকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' বলা যাবে। কিন্তু এগুলো থেকে আল্লাহ্র নাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' নাম দেয়া যাবে না। কেননা, কথাবার্তায় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ইনসাফ-যুলুম সবকিছুই থাকে। ইচ্ছাও তদ্রূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাউকে আব্দুল মুতাকাল্লেম বা আব্দুল মুরীদ বলা যাবে না এবং আল্লাহ্কে ডাকার জন্য 'ইয়া মুতাকাল্লেম!' 'ইয়া মুরীদ!' বলা যাবে না।

২) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো পুরোপুরিভাবেই উত্তম গুণ। সেগুলো কোন মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এগুলো গুণ হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে এগুলো থেকে নামও গ্রহণ করা যাবে আর আল্লাহ্র অধিকাংশ নামও এ ধরণের গুণসমৃদ্ধ। যেমন, রাহমান, রাহীম, সামী', বাছীর ইত্যাদি। এগুলো থেকে তাঁর নাম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জন্য দয়া, করুণা, শুনা ও দেখার গুণসমূহও সাব্যস্ত হবে।

৩) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো সাধারণতঃ উত্তম গুণ নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা উত্তম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই শুধু আল্লাহ্র গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন, ধোঁকা, কারসাজি, ঠাট্টা, কৌশল ইত্যাদি আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ ধোঁকা দেন, ঠাট্টা করেন ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে বলা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যারা তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করে, ধোঁকাবাজি করে তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, ধোঁকা দেন। এর দ্বারা আল্লাহ্র কোন অসম্মান বুঝা যায় না।

৪) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো কোন অবস্থাতেই উত্তমগুণ নয়। যেমন, অপারগতা, দুর্বলতা, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি। এ জাতীয় গুণাবলী আল্লাহ্র জন্য কোন অবস্থাতেই সাব্যস্ত করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আল্লাহ্র উত্তম গুণের অন্তর্ভুক্ত। [মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ]

(১) ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন, হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কেনার অর্থ, হিদায়াত ত্যাগ করে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করা। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তারা ঈমান

তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي

১৭. তাদের উপমা(১), ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্

এনেছে তারপর কুফরী করেছে। কাতাদাহ বলেন, তারা হিদায়াতের উপর ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করে নিয়েছে। এর সমর্থনে অন্য আয়াতে এসেছে, "আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল"। [সূরা ফুসসিলাত: ১৭] মোটকথা: তারা হিদায়াত বিমুখ হয়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুনাফেকদের সম্পর্কে দু'টো উপমা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর বলেন, দু'টি উপমা দু'ধরনের মুনাফিকদের জন্য দেয়া হয়েছে। প্রথম উপমার মর্মার্থ হলোঃ মুনাফেকরা হলো এমন ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকার কারণে অনেক কষ্টে আগুন জ্বালিয়েছে, যার আলোতে সে ভাল-মন্দ চিনতে পেরেছে। এবং আশা করছে যে, সে এ আলো তার জন্য স্থায়ী হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে সে আলো নিয়ে গেলেন। ফলে সে অন্ধকারে হিমশিম খেতে লাগল। যতটুকু আলো পেয়েছিল তাও চলে গেল, কিন্তু রয়ে গেল কষ্টদায়ক আগুন। এতে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- রাতের অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টির অন্ধকার ও আলোর পরে হঠাৎ করে সৃষ্ট অন্ধকার। অনুরূপভাবে মুনাফেকদের অবস্থা হলো -তারা ঈমানদার থেকে ঈমানের আলো পেয়েছে। তাদের কাছে সে আলোর লেশমাত্রও ছিল না। তারপর যখন তারা সাময়িকভাবে এর দ্বারা আলোকিত ও উপকৃত হলো, পার্থিব জীবনে হত্যা থেকে নিস্কৃতি পেল, সম্পদ রক্ষা পেল ও সাময়িক নিরাপত্তা লাভ করলো। ইত্যবসরে তাদের উপর মৃত্যু এসে পড়ল। ফলে তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলো। তাদের উপর আপতিত হলো যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও শাস্তি। এতে করে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- কবরের অন্ধকার, কুফরীর অন্ধকার, নিফাকের অন্ধকার, গোনাহ্র অন্ধকার সর্বোপরি জাহান্নামের অন্ধকার। যে অন্ধকার থেকে তার কোন মুক্তি নেই। [তাফসীর আস-সা'দী]

'আতা বলেন, এ আয়াতাংশ মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত। তারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ভালো মন্দ দেখে ও চিনে বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা তা কবুল করতে পারে না। ইবনে যায়েদ বলেন, তারা যখন ঈমান আনল, তাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলল, যেভাবে আগুন জ্বালালে চারদিক আলোকিত হয় ঠিক সেভাবে। এরপর যখন তারা কাফের হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমানের নূর বিলুপ্ত করে দিলেন, যেখানে আগুন নিভে গেলে আলো চলে যায়। ফলে তারা অন্ধকারে ডুবে গিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায়না।

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না(১)।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি(২) ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ, তারা হেদায়াত শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং তা বোঝতেও পারে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা কল্যাণ শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং বোঝতেও পারে না। সুতরাং তারা হেদায়াতের দিকে ফিরে আসবে না, কল্যাণের দিকেও নয়। ফলে তারা যেটার উপর রয়েছে সেটার উপরই থাকবে। সুতরাং নাজাত বা মুক্তি তাদের নসীবে জুটবে না। কাতাদাহ বলেন, তারা তাওবাহ করবে না এবং উপদেশও গ্রহণ করবে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ]
আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের বধির, বোবা ও অন্ধ হওয়ার অর্থ তারা তাদের এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল" [সূরা আল-আহকাফ: ২৬] [আদওয়াউল বয়ান]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহূদীরা জিজ্ঞেস করলো যে رَعْدٌ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্র ফেরেশতাদের মধ্য হতে এক ফেরেশতা। যাকে মেঘ-মালা সঞ্চালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার হাতে আগুনের চাবুক। সে এটা দিয়ে মেঘকে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ হয় সেখানে ধমকিয়ে ও হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। তারা বলল, তাহলে যে আওয়াজ শুনা যায় সেটা কি? তিনি বললেন, সেটা তার গর্জন। তারা বলল: আপনি সত্য বলেছেন। [তিরমিযী: ৩১১৭, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪]
ইবনে কাসীর বলেন, আয়াতে ظُلُمَاتٌ বা 'অন্ধকার' বলে তাদের সংশয়, অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নিফাক বোঝানো হয়েছে। আর رَعْدٌ বা বজ্রধ্বনি বলে এমন গর্জন বোঝানো হয়েছে, যা তাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। মুনাফিকদের জন্য তা অত্যধিক শংকাগ্রস্ত ও কম্পন সৃষ্টিকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে"[সূরা আল-মুনাফিকুন: ৪]

حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন(১)।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۭ كُلَّمَآ اَضَاۗءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২০. বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়(২)। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থম্‌কে দাঁড়ায়(৩)। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে

অন্যত্র বলেন, "ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে। ওরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে ওদিকেই দ্রুত পালিয়ে যাবে।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৬-৫৭]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করবেন। সে জন্য তারা তার বেষ্টনী থেকে বের হতে পারবে না। মুজাহিদ বলেন, বেষ্টন করার অর্থ, তিনি তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) একত্রিত করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফের-মুনাফিকদের সকল দিক থেকেই ঘিরে রেখেছেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত--- ফির'আউন ও সামূদের? তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত; আর আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" [সূরা আল-বুরুজ: ১৭-২০]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে بَرْقٌ বলে, কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলো বা হকের তীব্র আলো যেন মুনাফিকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে চায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে যে উপমা দিচ্ছেন তার মর্মার্থ হলো- এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে পথ অতিক্রম করছে, যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অন্ধকার। রাতের আঁধার, মেঘের আঁধার এবং বৃষ্টির আঁধার। আরও রয়েছে তাতে বিকট শব্দসম্পন্ন বজ্র, বিদ্যুত চমক। এ ভীষণ অন্ধকারে যখন বিদ্যুত চমকায় তখন সে সামনে এগোয়, আবার যখন অন্ধকারে চেয়ে যায় তখন সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। মুনাফেকদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা, যখন তারা কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা শোনে তখন তারা নিজেদের কানে আঙুল দেয়। কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার–শাস্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ এগুলো তাকে বিব্রত করে। তারা এগুলোকে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বজ্রের শব্দকে

তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান(১)।

অপছন্দ করে কানে আঙুল দিত। কিন্তু মুনাফেকরা যত বিব্রতই হোক তারা কোনভাবেই নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। তারা কোনভাবেই তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না বা তাঁকে অপারগও করে দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে সে অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [তাফসীর আস-সা'দী]

ইবনে কাসীর বলেন, এই দ্বিতীয় উপমা সেই মুনাফিকদের জন্য যাদের কাছে সত্য কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার কখনো তারা সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি এখানে অন্ধকার অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। সে অন্ধকার হচ্ছে, সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তদুপরি তারা থাকে সীমাহীন ভীতিপ্রদ অবস্থায়। সুতরাং সত্য যখন সে চিনতে পায়, তখন সে তা নিয়ে সে কথা বলে এবং এর অনুসরণও করে, কিন্তু যখন তাদের দোদুল্য মন কুফরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা হবে এই যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী নূর দেয়া হবে, কেউ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, আবার কেউ কেউ তার চেয়েও বেশী, কেউ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেউ এতটুকু পাবে যে, কিছুক্ষণ আলোকিত হয়ে আবার তা অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার তা নিবে যাবে। আবার এমন কিছু লোকও হবে যাদের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যাবে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুনাফিক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন, "সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর"। [সূরা আল-হাদীদ: ১৩]

(১) উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে এ পযন্ত মানুষকে কয়েক শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. খাঁটি মুমিন। সূরা আল-বাকারার প্রথম চার আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দুই. খাঁটি কাফের। তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে। তিন. মুনাফিক, যারা আবার দুশ্রেণীর। প্রথম. খাঁটি মুনাফেক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়. সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মুনাফিক। তারা কখনো ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়, কখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বজ্র ও বিদ্যুতের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দলের অবস্থা থেকে তাদের মুনাফেকী একটু নরম। এ বর্ণনার সাথে সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে। [ইবনে কাসীর]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

২১. হে মানুষ(১)! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর(২) 'ইবাদাত কর যিনি

এর মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুমিনরা দু'ভাগে বিভক্ত। এক. সাবেকুন বা মুকাররাবুন, দুই. আসহাবুল ইয়ামীন, আবরার বা সাধারণ মুমিন। আর কাফেররা দু'ভাগে বিভক্ত: এক. অনুসৃত, বা কুফরির দিকে আহ্বানকারী কাফের দল, দুই. অনুসারী বা অনুসরণকারী সাধারণ কাফেররা। অনুরূপভাবে মুনাফিকদেরও শ্রেণী দু'টি। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক হচ্ছে সেসব কট্টর মুনাফিক যাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে ঈমানের কিছু থাকলেও নিফাকের সব চরিত্র তাদের মধ্যে বিদ্যমান। [ইবনে কাসীর]

(১) আয়াতে উল্লেখিত 'নাস' আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের মুমিন-কাফির ও মুনাফিক এ তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রব-এর 'ইবাদাত কর'। 'ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ নম্র ও অনুগত হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদাত হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের ব্যাপক একটি নাম'। এ সমস্ত কথা ও কাজ পরিপূর্ণ ভালবাসা ও পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র জন্য আদায় করলেই তা আমাদের পক্ষ থেকে 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেসব কাজ বা কথা ভালবাসেন তার বাইরে কোন কিছুর মাধ্যমে আমরা তাঁর 'ইবাদাত করতে পারব না। ইবাদাতের ভিত্তি তিনটি রুকনের উপর স্থাপিত। এক. আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৬৫] দুই. পরিপূর্ণ আশা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭] তিন. আল্লাহ্কে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭]

(২) এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যেকোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুনান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে এ কথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মানুষকে অগণিত এ নেয়ামত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন(১), যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও(২) ।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ

২২. যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং

দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি । আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী । যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয় । এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার 'ইবাদাতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ 'ইবাদাতের যোগ্য নয় ।

(১) এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নির্দেশ, আর সে নির্দেশই হচ্ছে তাওহীদের । ইসলামের মৌলিক আক্বীদা তাওহীদ বিশ্বাস । যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায় । এটি মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী ।
তাওহীদ শব্দটি মাসদার বা মূলধাতু । যার অর্থ- কোন কিছুকে এক বলে জানা এবং ঘোষণা করা । সে অনুসারে আল্লাহ্র একত্ববাদ অর্থ- আল্লাহ্ যে এক তা ঘোষণা করা । শরী'আতের পরিভাষায় তাওহীদ বলতে বুঝায় একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ই একমাত্র মা'বুদ । তাঁর কোন শরীক নাই । তাঁর কোন সমকক্ষ নাই । একমাত্র তাঁর দিকেই যাবতীয় 'ইবাদাতকে সুনির্দিষ্ট করা । তাঁর যাবতীয় সুন্দর নাম ও গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করা । এতে বুঝা গেল যে, তাওহীদ হলো আল্লাহ্কে রবুবিয়াত তথা প্রভূত্বে, তাঁর সত্তায়, নাম ও গুণে এবং 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক সত্তা বলে স্বীকৃতি দেয়া । তাই এ তাওহীদ বিশুদ্ধ হতে হলে এর মধ্যে তিনটি অংশ অবশ্যই থাকতে হবে - (১) আল্লাহ্র প্রভূত্বে ঈমান ও সে অনুসারে চলা । যা 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' নামে খ্যাত । (২) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে ঈমান আর সেগুলো তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা । যাকে 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' বলা হয় । আর (৩) যাবতীয় 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট করা । যাকে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'ও বলা হয় । এ তিন অংশের কোন অংশ বাদ পড়লে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা হবে না এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে না ।

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করলেই তাকওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে নতুবা নয় । যাদের কর্মকাণ্ডে শির্ক রয়েছে, তারা যত পরহেযগারী বা যত আমলই করুক না কেন তারা কখনো মুত্তাকী হতে পারবে না । তাই জীবনের যাবতীয় ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য খালেসভাবে করতে হবে । এটা জানার জন্য ইবাদাত ও শির্ক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে । যার আলোচনা সামনে আসবে ।

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ(১)

(১) আয়াতে উল্লেখিত أَندَاد শব্দটি ند এর বহুবচন। যার অর্থ সমকক্ষ স্থির করা। এখানে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ সমকক্ষ স্থির করাটাই শির্ক। আর শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ্। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি সৃষ্টি করেছেন...। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

শির্কের প্রকারভেদঃ শির্ক দু'প্রকার, যথা- বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।

বড় শির্ক আবার দু'প্রকার। আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বে শির্ক করা। আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত তথা 'ইবাদাতে শির্ক করা।

আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্বে শির্ক দু'ভাবে হয়ে থাকে -

১) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার না করা যেমন কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক, মুলহিদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌র নাম, গুণ ও কর্মকাণ্ডকে স্বীকার না করা, যেমন- ঈসমা'ঈলী সম্প্রদায়, বাহাই সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, জাহমিয়া ও মু'তাজিলা সমপ্রদায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে পার্থক্য না করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করে দেখা যেমন ওয়াহদাতুল অজুদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা মনে করে যে, আল্লাহ্ কোন কিছুর সূরত ইখতিয়ার করে তাতে নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন, হুলুলী সম্প্রদায় এবং যারা বিশ্বাস করে যে, কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

২) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র সত্তা, নাম, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা।

ক) আল্লাহ্‌র স্বত্ত্বার সমকক্ষ কোন সত্তা নির্ধারণ করার মত কোন শির্ক বনী আদমের মধ্যে বিরল। এ ধরণের দাবী প্রথম নমরূদ করেছিল, কিন্তু ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে বিতর্কে সে তার সে দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে হেরে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ফির'আউনও প্রকাশ্যে এ ধরণের দাবী করেছিল। আল্লাহ্ তাকে স্বপরিবারে দলবলসহ ধ্বংস করে তার দাবীর অসারতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

খ) আল্লাহ্‌র নামসমূহের কোন নাম অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করার মত শির্ক বিভিন্ন জাতিতে বিদ্যমান। যারাই তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ্‌র নামের মত নাম দেয় তারাই এ ধরণের শির্কে লিপ্ত। যেমন হিন্দুগণ তাদের বিভিন্ন অবতারকে আল্লাহ্‌র নামসমূহের মত নাম দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন কোন বাতেনী গ্রুপের লোকেরা যেমন, দ্রুজ সম্প্রদায়, নুসাইরী সম্প্রদায়, আগাখানী ঈসমাঈলী সম্প্রদায় তাদের ঈমামদেরকে আল্লাহ্‌র নামসমূহে অভিহিত করে।

গ) আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডের কোন শেষ নেই। সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত এবং হুকুম ও শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত।

১. আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে যারা শির্ক করে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, মৃত্যু, জীবন, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার, উদ্দেশ্য হাসিলকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকে কবরবাসী কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে জাদুকর জাতীয় লোকদের সম্পর্কেও এ ধরণের বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে এ ধরণের বিশ্বাস করে।

২. আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে তারা গায়েব জানে। আবার অনেকে কবরবাসী কোন কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে গণক, জ্যোতিষ, জ্বিন, প্রেতাত্মা, ইত্যাদীতে বিশ্বাস করে যে, তারাও গায়েব জানে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তারা গায়েব জানতো।

৩. আল্লাহ্‌র শরী'আত ও হুকুমের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র মত শরী'আত প্রবর্তনের অধিকার তাদের আলেম ও শাসকদের দিয়ে থাকে। যেমন, ঐ সমস্ত জাতি যারা সরকার বা পার্লামেন্টকে আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী আইন রচনার অনুমতি দিয়েছে। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য আইনে বিচার করা শ্রেয় বা জায়েয বা আল্লাহ্‌র আইন ও অন্যান্য আইন সমমানের মনে করে থাকে। শির্কের এ সমস্ত প্রকার আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্কঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্ক বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ যা কিছু ভালবাসেন সন্তুষ্ট হন বান্দার এমন সব কথা ও কাজ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। যেমন আল্লাহ্ তাঁর কাছে দো'আ করা ভালবাসেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া ভালবাসেন, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা ভালবাসেন, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে বিনয়ী হওয়া ভালবাসেন, তাঁর জন্যই সিজ্‌দা, রুকু,

দাঁড় করিও না।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর(১) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে(২) আহ্বান কর, যদি

সালাত, যবেহ, মানত ইত্যাদী ভালবাসেন। এর কোন কিছু যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করে তবে তা হবে আল্লাহ্র ইবাদাতে শির্ক। অনুরূপভাবে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র মত ভালবাসলে, অন্য কারো কাছে পরিপূর্ণ আশা করলে, অন্য কাউকে গোপন ভয় করলেও তা শির্ক হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু বান্দার ইবাদাতসমূহ বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, সে হিসাবে ইবাদতের মধ্যেও এ তিন ধরণের শির্ক পাওয়া যায়। অর্থাৎ কখনো কখনো ইবাদত হয় মনের ইচ্ছার মাধ্যমে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয় বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয়ে থাকে কথাবার্তার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রকার শির্ক হলোঃ ছোট শির্ক, কিন্তু তা'ও কবীরাগুনাহ হতে মারাত্মক। ছোট শির্কের উদাহরণ হলো, এ প্রকার বলা যে, কুকুর না ডাকলে চোর আসত, আপনি ও আল্লাহ্ যা চান, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, সামান্য লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা। ইত্যাদি। [ইবনুল কাইয়্যেম, 'আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা 'আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী'; শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আত-তামীমী, আল-ওয়াজিবুল মুতাহাত্তিমাতুল মা'রিফাহ'; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল। আর এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে নবুওয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। [ইবনে কাসীর]

(২) شُهَدَاء শব্দের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, أَعْوَانُكُمْ বা সাহায্যকারীগণ। অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় আহ্বান কর যারা তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে। আবু মালেক বলেন, এর অর্থ, شُرَكَاءَكُمْ তোমাদের অংশীদারদেরকে বা যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক করছ সে শরীকদেরকে আহ্বান করে দেখ তারা কি এর অনুরূপ কোন সূরা আনতে পারে কি না? মুজাহিদ বলেন, شُهَدَاء শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন লোকদের আহ্বান করে নিয়ে আস যারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হবে যে, আল্লাহ্র কালামের বিপরীতে যা নিয়ে আসবে তা আল্লাহ্র

তোমরা সত্যবাদী হও(১)।

কালামের মত হয়েছে। ভাষাবিদদের সাক্ষ্য এর সাথে যোগ করে দাও। পবিত্র কুরআনে এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে এসেছে। মক্কী সূরায়ও এমন চ্যালেঞ্জ এসেছিল। বলা হয়েছে, "এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সমর্থক এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা কি বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৮] তারপর মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাসমূহেও এ ধরনের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-বাকারাহ এর আলোচ্য আয়াত। [ইবনে কাসীর]

(১) কুরআন নিয়ে যারাই গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর ভাষাগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়েই এটা অতুলনীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত"। [সূরা হূদ: ১] সুতরাং কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও তার মর্ম সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই তা অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। সব সৃষ্টিজগত তার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও ভালো মন্দ সম্পর্কিত সব কিছুই সুনিপুণভাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] অর্থাৎ যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত। আর যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন বিধানদাতা হিসেবে সেগুলোর ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি ও পথের দিশারী। এতে কোন ধারণাপ্রসূত কথা, রূপকথা কিংবা কাল্পনিক গালগল্প ও মিথ্যাচার যা সাধারণত কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়, এতে এর বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও নেই।

কুরআনের মজীদের পুরোটাই হচ্ছে উচ্চাঙ্গের কথামালা। অনন্য ভাষাশৈলীতা এবং হৃদয়স্পর্শী উপমায় ভরপুর। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাই কেবল কুরআনের ভাষারীতি ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। কুরআন যখন কোন খবর প্রকাশ করে, হোক তা বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত, আবার তা যদি একবারের জায়গায় বারবারও বলা হয়, তথাপি তার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করবে ততই যেন অজানা এক স্বাদে মন উত্তরোত্তর উদ্বেলিত হয়েই চলবে। তার বারবার পাঠ করলে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন না। আল-কুরআনের ভীতি

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না[১], তাহলে তোমরা সে আগুন

প্রদর্শনমূলক আয়াত ও কঠোর সতর্কবাণী ভালো করে অনুধাবন করলে কঠিন মানুষ তো দূরের কথা পাহাড় পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে থাকে।

অনুরূপভাবে তার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণ দেখলে ও হৃদয়ঙ্গম করলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়, অবরুদ্ধ শ্রবণশক্তি প্রত্যাশার পদ-ধ্বনি শুনতে পায়। আর মৃত মন ইসলামের অমিত শরবত পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এসব কিছু মিলে অজান্তে হৃদয়ে শান্তিধাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর মহান আল্লাহ্‌র আরশের কাছে থাকার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। এ কুরআনের বিষয় বৈচিত্র আশ্চর্যজনক। ভাষার অলংকারের ঔজ্জ্বল্য, নসীহতের প্রাচুর্য, হাজারো যুক্তি প্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য কুরআনকে গ্রন্থ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। বিধিনিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক প্রাচীন মনীষী বলেছেন, ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ﴾ শোনার সাথে সাথে মনোযোগের সাথে কান পেতে পরবর্তী বক্তব্য শোন। কারণ, তারপর হয়ত কোন কল্যাণের পথে আহ্বান থাকবে, না হয় কোন অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ঘোষিত হবে। [ইবন কাসীর]

আর যদি আল-কুরআনে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ চিত্র, চির সুখের জান্নাতের নেয়ামতরাজী, জাহান্নামের চিরন্তন দূর্ভোগের বিবরণ, নেককারদের লোভনীয় পুরস্কার আর গুনাহগারদের নানা রকম ভয়াবহ শাস্তি, দুনিয়ার সম্পদ ও সুখ সম্ভোগের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ সম্ভোগের অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় তবে তা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এসব বর্ণনা মানুষকে বার বার ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভয়ে বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচণায় জমানো অন্তরের কালি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। আল- কুরআনের এ ধরনের অবিস্মরণীয় ও আশ্চর্যজনক মু'জিযার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের ঈমান আনার জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী হচ্ছে আমার মু'জিযা। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে।" [বুখারী: ৪৯৮১, মুসলিম: ১৫২] কারণ, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বর্তমান থাকবে। সর্বকালের মানুষের কাছে অবিসংবাদিত হিসেবে থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(১) এটা কুরআনের বিশেষ মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নিঃসংকোচে সর্বকালের জন্য নিজ স্বীকৃত সত্তার এভাবে ঘোষণা দিতে পারে। যেভাবে রাসূলের যুগে কেউ এ কুরআনের মত আনতে পারে নি। তেমনি কুরআন এ ঘোষণাও নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচে দিতে পেরেছে যে, যুগের পর যুগের জন্য, কালের পর কালের জন্য এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া

থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর(১), যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে(২) কাফেরদের জন্য ।

হচ্ছে যে, এ কুরআনের মত কোন কিতাব কেউ কোন দিন আনতে পারবে না । অনুরূপই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে । রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এ কুরআনের মত কিছু আনার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি । আর কোনদিন পারবেও না । গোটা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর কথার সমকক্ষ কোন কথা কি কোন সৃষ্টির পক্ষে আনা সম্ভব?

(১) ইবনে কাসীর বলেন, এখানে 'পাথর' দ্বারা কালো গন্ধক পাথর বোঝানো হয়েছে । গন্ধক দিয়ে আগুন জ্বালালে তার তাপ ভীষণ ও স্থায়ী হয় । আসমান যমীন সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে দিয়েছেন । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ঐ সমস্ত পাথর উদ্দেশ্য, যেগুলোর ইবাদাত করা হয়েছে । [ইবনে কাসীর] আর জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ এক ভাগ দিয়ে শাস্তি দিলেই তো যথেষ্ট হতো । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত ।" [বুখারী: ৩২৬৫, মুসলিম: ২৪৮৩]

(২) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এখানে أُعِدَّتْ এর সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের দিকে । অবশ্য এ সর্বনামটি পাথরের ক্ষেত্রেও হতে পারে । তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলো কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে উভয় অর্থের মধ্যে বড় ধরনের কোন তফাৎ নেই । একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আগুন বিহীন যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর বিহীন আগুনের দাহ্য ক্ষমতাও বাড়ে না । সুতরাং উভয় উপাদানই কাফেরদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।

আয়াতের এ অংশ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ দলীল নেন যে, জাহান্নাম বর্তমানে তৈরী করা অবস্থায় আছে । জাহান্নাম যে বাস্তবিকই বর্তমানে রয়েছে তার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় । যেমন, জাহান্নাম ও জান্নাতের বিবাদের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস [বুখারী: ৪৮৪৯, মুসলিম: ২৮৪৬] , জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক তাকে বছরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা [বুখারী: ৫৩৭, মুসলিম: ৬৩৭] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক হাদীসে আছে, "আমরা একটি বিকট শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, এটা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়ায ।" [মুসলিম: ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭১] তাছাড়া সূর্যগ্রহণের

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত(১)। যখনই তাদেরকে ফলমুল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হত এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই(২) এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী(৩)। আর তারা সেখানে স্থায়ী

সালাত এবং মিরাজের রাত্রির ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই তৈরী করে রাখা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(১) 'জান্নাতের তলদেশে নদী প্রবাহিত' বলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এর গাছের নীচ দিয়ে ও এর কামরাসমূহের নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতের নদী-নালাসমূহ মিশকের পাহাড় থেকে নির্গত। [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭৪০৮] আনাস ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, 'জান্নাতের নহরসমূহ খাদ হয়ে প্রবাহিত হবে না' [সহীহুত তারগীব] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাউজে কাউসারের দুই তীর লালা-মোতির গড়া বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট হবে। [বুখারী: ৬৫৮১] আর তার মাটি হবে মিশকের সুগন্ধে ভরপুর। তার পথে বিছানো কাঁকরগুলো হলো লাল-জহরত, পান্না-চুন্নি সদৃশ। [ইবনে কাসীর]

(২) জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন তাফসীরকারের মতে ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ জান্নাতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অপর কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ, জান্নাতে পরিবেশিত ফল-মূলাদি দেখে জান্নাতিগণ বলবে যে, এটা তো গতকালও আমাদের দেয়া হয়েছে, তখন জান্নাতের খাদেমগণ তাদের বলবে যে, দেখতে একই রকম হলেও এর স্বাদ ভিন্ন। ইবনে আব্বাস বলেন, দুনিয়ার ফলের সংগে আখেরাতের ফল-মূলের কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(৩) মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে 'যওজ', অর্থ হচ্ছে জোড়া। এ শব্দটি স্বামী বা স্ত্রী অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ'।

হবে(১)।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না(২)। অতঃপর যারা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن

তবে আখেরাতে আযওয়াজ অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলূষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে যে, "তাদের সংগে থাকবে আয়তনয়না, ডাগর চোখ বিশিষ্টাগণ" [সূরা আস-সাফফাত: ৪৮] আরও বলা হয়েছে, "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল" [সূরা আর-রহমান: ৫৮] আরও এসেছে, "আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা" [সূরা আল-ওয়াকি'আ:২২-২৩] অনুরূপভাবে এসেছে, "আর সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" [সূরা আন-নাবা: ৩৩] যদি দুনিয়ার কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ, তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎ পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী-স্ত্রী দুজনই সৎকর্মশীল হয়, তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

(১) বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যেকোন মূহুর্তে ধ্বংস ও বিলুপ্তির আশংকা থাকে। বরং জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করে বিমল আনন্দ-স্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন। [ইবনে কাসীর]

(২) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মাকড়সা ও মাছি উদাহরণ পেশ করার পর মুশরিকরা বলাবলি করল যে, মাকড়সা ও মাছি কি উল্লেখযোগ্য কিছু? তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়া বলেন, মশার উদাহরণ দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা হচ্ছে, 'এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় এবং সময় নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা মশার মত প্রাণীতে পরিণত হয়। কারণ, মশা পেট ভরলে মরে যায়, আর যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা যাদের জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তারাও দুনিয়ার জীবিকা শেষ

رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা[১] তাদের রব-এর পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এ উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে হেদায়াত করেন। আর তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না[২]---

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়[৩], তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায়

করার পর আল্লাহ্ শক্ত হাতে তাদের পাকড়াও করবেন এবং তাদের ধ্বংস করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ঈমানদাররা নিশ্চিত জানে যে, এ উপমা প্রদান করা হক্ব বা যথাযথ। অথবা এর অর্থ, তারা জানে যে, এটা আল্লাহ্র বাণী এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক হিসেবে তাদের কাছে এসেছে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তারা ফাসেক বা অবাধ্য হওয়াতেই তাদের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কেউ খারাপ পথে চলতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে সে পথে চলতে দেন।

(৩) আবুল আলীয়া বলেন, এটি মুনাফিকদের ছয়টি স্বভাবের অন্তর্গত। তারা কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, সাথে সাথে আয়াতে বর্ণিত তিনটি কাজ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ

২৯. তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর(১) তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ(২) করে

(১) এখানে যমীন সৃষ্টির পরে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াত বাহ্যতঃ এর বিপরীত মনে হয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এটা জানাই যথেষ্ট যে, সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে আসমানের আগেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার মধ্যে খাবার জাতীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেটাকে আসমান সৃষ্টির পূর্বে প্রসারিত ও সামঞ্জস্যবিধান করেন নি। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগী হয়ে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেন। তারপর তিনি যমীনকে সুন্দরভাবে প্রসারিত ও বিস্তৃত করেছেন। এটাই এ আয়াত এবং সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াতের মধ্যে বাহ্যতঃ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করার আগেই যমীন সৃষ্টি করেন। যমীন সৃষ্টির পর তা থেকে এক ধোঁয়া বা বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর সেটাই আল্লাহ্র বাণী: "তারপর তিনি আসমান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে, সেটা ছিল ধুম্রাকার" [সূরা ফুসসিলাত: ১১] [ইবনে কাসীর]

(২) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে اسْتَوَى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার অর্থে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় তা তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে:

১) اسْتَوَى শব্দটি যেখানে পূর্ণ ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তার পরে على বা إِلَىٰ কিছুই না আসে তখন তার অর্থ হবে, সম্পূর্ণ হওয়া বা পূর্ণতা লাভ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেনঃ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ আর যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণতা লাভ করলেন। [সূরা আল-কাসাসঃ ১৪]

২) اسْتَوَى শব্দটির সাথে যদি على আসে তখন তার অর্থ হবে - উপরে উঠা, আরোহণ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেনঃ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤ يونس:٣ الرعد:٢ الفرقان:٥٩ السجدة:٤، الحديد:٤] অর্থাৎ তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। অনুরূপভাবে সূরা طه তে এসেছেঃ [طه:٥] ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ দয়াময় (রহমান) আরশের উপর উঠলেন।

اسْتَوَىٰ শব্দটির সাথে যদি إِلَىٰ আসে তখন তার অর্থ হবে - ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, মনোনিবেশ করা। আর সে অর্থই এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ -

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদের(১) বললেন(২), 'নিশ্চয়

এর অর্থ করা হবে - আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। তবে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানেও উপরে উঠার অর্থ হবে।

শেষোক্ত দু'অবস্থায় اسْتَوَىٰ শব্দটি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা তাঁর একটি সিফাত বা গুণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ্‌র জন্য সে সিফাত বা গুণ কোন প্রকার অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন, সদৃশ নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।

(১) এখানে মূল আরবী শব্দ 'মালায়িকা' হচ্ছে বহুবচন। এক বচন 'মালাক'। মালাক-এর আসল অর্থ হচ্ছে 'বাণী বাহক'। এরই শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, 'যাকে পাঠানো হয়েছে' বা ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও কাজ-কর্মে অংশীদার মনে করে। আবার কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহ্‌র আত্মীয়। এজন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে তৈরী করা হয়েছে, জ্বিনদেরকে নির্ধুম আগুন শিখা হতে। আর আদমকে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।" [মুসলিম: ২৯৯৬] অর্থাৎ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে এমন এক মুষ্ঠি মাটি থেকে তৈরী করেছেন। যে মাটি তিনি সমস্ত যমীন থেকে নিয়েছেন। তাই আদম সন্তানরা যমীনের মতই বৈচিত্রারূপে এসেছে। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং এর মাঝামাঝি ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। আর তাদের মধ্যে সহজ, পেরেশান, খারাপ ও ভাল সবরকমের সমাহার ঘটেছে।" [তিরমিযী: ২৯৫৫, আবুদাউদ: ৪৬৯৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬১, ২৬২]

(২) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে এ সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইংগিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশ্‌তাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের কারণ তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশ্‌তাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা,

خَلِيفَةً قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

আমি যমীনে খলীফা[১] সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে[২]? আর আমরা

পুণ্য ও সততা তাদের প্রকৃতিগত গুণ। তারা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল, তা আল্লাহ্‌ শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকিফহাল নও। তা শুধুমাত্র আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত। অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশ্‌তাদের উপর আদম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশ্ব-খেলাফতের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(১) আয়াতে বর্ণিত 'খলীফা' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, আমি তোমাদের ছাড়া এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছি যারা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। ইবনে জারীর বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি যমীনে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাই, যে আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইনসাফের সাথে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে। আর এ প্রতিনিধি হচ্ছে আদম এবং যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে তার বিধান প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হবে।

(২) এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ফেরেশতারা কিভাবে জানতে পারল যে, যমীনে বিপর্যয় হবে? এর উত্তর বিভিন্নভাবে এসেছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ যমীনে পূর্বে জ্বিনরা বাস করত। তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। [দেখুন, অনুরূপ বর্ণনা মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৮৭] ফেরেশতারা তাদের উপর কিয়াস করে একথা বলেছিলেন। আবার কারও কারও মতে, তারা মাটি থেকে আদমের সৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের মধ্যে বিপর্যয় হবে। কাতাদাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন যে, যমীনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যদি কোন সৃষ্টি রাখা হয় তবে তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, রক্ত প্রবাহিত করবে। আর এজন্যই তারা বলেছিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে?' [তাবারী] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে কিছু কথা উহ্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বললেন যে, আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা বলল যে, হে আমাদের রব! সে কেমন খলীফা? আল্লাহ্‌ বললেন, তাদের সন্তান-সন্ততি হবে এবং তারা ঝগড়া ফাসাদ ও হিংসা বিভেদে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে। তখন তারা বলল, আপনি কি

আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি(১)। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জান না'(২)।

যমীনে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আল্লাহ্ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না। [ইবনে কাসীর] ইবনে জুরাইজ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সৃষ্টির ব্যাপারে সংঘটিত সব অবস্থা বর্ণনার পর তাদেরকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তারা এ বক্তব্য পেশ করেন। তারা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদের রব! আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কি করে তারা আপনার নাফরমান সাজবে? এমন নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে এ জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের ব্যাপারে তোমরা কিছু কথা জেনে থাকলেও অনেক কিছুই জান না। তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্য থেকে অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] ইমাম তাবারী বলেন, ফেরেশতাগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন অজানা বিষয় জানার জন্যে। তারা যেন বললেন, হে আমাদের রব! আমাদেরকে একটু অবহিত করুন। সুতরাং এর উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি নয়; বরং উদ্দেশ্য অবগত হওয়া। [তাবারী]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উত্তম বাক্য কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ বাক্য যা আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তারা যা বলেছেন, সেটা হলো: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী"। [মুসলিম: ২৭৩১]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আল্লাহর জ্ঞানে ছিল যে, এই খলীফার মধ্য হতে নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন ফেরেশতাগণ বান্দার আমল নিয়ে আসমানে আল্লাহর দরবারে পৌঁছেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা -সবকিছু জানা সত্ত্বেও- প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা সবাই জবাবে বলেন, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি এবং আসার সময় সালাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি।' [বুখারী: ৫৫৫, মুসলিম: ৬৩২] কারণ তারা একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলে যায় এবং আরেক দল আসরে আসে এবং ফজরে চলে যায়। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রাতের আমল দিনের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আগেই পৌঁছে থাকে।" [মুসলিম: ১৭৯] আল্লাহ্ তা'আলা জবাব, ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ এর এটাই যথার্থ তাফসীর। [ইবনে কাসীর] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ জানতেন যে, ইবলীস অবাধ্য হবে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত অবাধ্যতার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, ফেরেশতাদের ﴿أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ﴾ এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন(১), তারপর সেগুলো(২) ফেরেশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই।

﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ বলেছেন। কেননা পুরো বক্তব্যেই বনী আদমের স্থলে তাদের পৃথিবীতে বসবাসের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তোমরা আকাশের উপযোগী এবং আকাশে অবস্থানই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তোমরা সেটা বুঝতে পারছ না। [ইবনে কাসীর ও তাফসীরে কাবীর]

(১) অর্থাৎ আগে যে খলীফা বানানোর ঘোষণা আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আদম। সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আদমকে আদম এজন্যই নাম রাখা হয়েছে, কারণ তাকে যমীনের 'আদীম' বা চামড়া অর্থাৎ উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [তাবাকাতু ইবনে সা'দ, তাবারী] আয়াত থেকে আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, আদম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কথা বলেছেন। হাদীসে এসেছে, আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আদম কি নবী ছিলেন? রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, যার সাথে কথা বলা হয়েছে'। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, তার মাঝে ও নূহের মাঝে ব্যবধান কেমন? রাসূল বললেন, দশ প্রজন্ম।" [ইবনে হিব্বান: ৬১৯০] প্রশ্ন হতে পারে যে, আদম আলাইহিস সালামকে কি কি নাম শিখানো হয়েছিল? কাতাদাহ বলেন, সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, যেমন এটা পাহাড়, এটা সমুদ্র, এটা এই, ওটা সেই, প্রত্যেকটি বস্তুর নাম। তারপর ফেরেশতাগণের কাছে সেগুলো পেশ করে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। [তাবারী, ইবনে কাসীর] আর তা ছিল মূলত: সমস্ত সৃষ্টিকুলের নাম এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নাম। বিখ্যাত শাফা'আতের হাদীসেও এসেছে যে, "মানুষজন কিয়ামতের মাঠে যখন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে বলবে যে, আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সাজদাহ করিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং وَعَلَّمَكَ أَسۡمَآءَ كُلِّ شَيۡءٖ বা সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" [বুখারী: ৪৪৭৬]

(২) ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, যে সমস্ত বস্তুর নাম আদমকে শিখিয়ে দিলেন সে বস্তুগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে তাদের কাছে এগুলোর নাম জানতে চাওয়া হলো। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’।

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣

৩৩. তিনি বললেন, ‘হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন’। অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ্) বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে’(১)।

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤

৩৪. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর(২), তখন

(১) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়া বলেন, তারা যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, আমাদের রব আল্লাহ্ তা‘আলা যা-ই সৃষ্টি করুক না কেন আমরা তার থেকে বেশী জ্ঞানী ও সম্মানিত থাকব। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা যা প্রকাশ করেছিল তা হলো, “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে”। আর যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, ইবলীস তার মনের মধ্যে যে গর্ব ও অহঙ্কার গোপন করে রাখছিল তা। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করার হুকুম ফেরেশ্‌তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশ্‌তাই সিজ্‌দা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সিজ্‌দার নির্দেশ ইবলিসের প্রতিও ছিল। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশ্‌তাগণের উল্লেখ এ জন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে ইবলিস অতি উত্তম রূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল। অথবা সে যেহেতু ফেরেশতাদের দলের মধ্যেই অবস্থান করছিল তখন তাকে অবশ্যই নির্দেশ পালন করতে হত। সে নিজেকে নির্দেশের বাইরে মনে করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। শুধুমাত্র তার গর্ব ও অহঙ্কারই তাকে তা করতে বাধা দিচ্ছিল। [ইবনে কাসীর]
এ আয়াতে আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করতে ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এ ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পিতা-মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌঁছার পর ইউসুফকে সিজ্‌দা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

ইব্‌লিস[১] ছাড়া সকলেই সিজ্‌দা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল[২]। আর সে কাফেরদের

এটা সুস্পষ্ট যে, এ সিজ্‌দা 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের 'ইবাদাত শির্ক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরী'আতে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীনকালের সিজ্‌দা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মু'আনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহ্‌কামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজ্‌দা করা বৈধ ছিল। শরী'আতে মুহাম্মাদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসেবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ'-সিজ্‌দা এবং সালাতের মত করে হাত বেঁধে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজ্‌দায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সিজ্‌দার বৈধতার প্রমাণ তো কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? উত্তর এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক হাদীস দ্বারা সিজ্‌দায়ে তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যদি আমি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজ্‌দা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে তার বৃহৎ অধিকারের কারণে সিজ্‌দা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরী'আতে সিজ্‌দায়ে-তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজ্‌দা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮]

(১) 'ইবলিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'চরম হতাশ'। আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জ্বিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহ্‌র হুকুমের নাফরমানী করে আদম ও আদম-সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার ও কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহ্‌র কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস মানুষের মত একটি কায়াসম্পন্ন প্রাণীসত্তা। তাছাড়া সে ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ ভুল ধারণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোতে কুরআন নিজেই তার জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকার এবং ফেরেশ্‌তাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কারও অবশিষ্ট থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অন্তর্ভুক্ত হল[১]।

৩৫. আর আমরা বললাম, 'হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী[২] জান্নাতে বসবাস করুন

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا

[আবুদাউদ: ৪০৯১] আর ইবলীসের মন ছিল গর্ব ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র সমীপ থেকে দূরিভুত হওয়াই ছিল তার জন্য যুক্তিযুক্ত শাস্তি।

(১) সুদ্দী বলেন, সে ঐ সমস্ত কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল যাদেরকে আল্লাহ্ তখনও সৃষ্টি করেননি। যারা তার পরে কাফের হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বলেন, আল্লাহ্ ইবলীসকে কুফরী ও পথভ্রষ্টতার উপরই সৃষ্টি করেছেন, তারপর সে ফেরেশতাদের আমল করলেও পরবর্তীতে যে কুফরির উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে তার দিকেই ফিরে গেল। [ইবনে কাসীর]

(২) কুরআনের বাকরীতি দ্বারা বোঝা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত করার পর আদমের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আদম আলাইহিস সালামকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হল এবং তার বাম পাঁজর থেকে একখানা হাড় নেয়া হলো। আর সে স্থানে গোশ্‌ত সংযোজন করা হলো। তখনও আদম ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন হাড় থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হল এবং তাকে যথাযথ রূপ দান করা হল যেন আদম তার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটল এবং নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন, তখন হাওয়াকে তার পাশে বসা দেখলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, আমার গোশ্‌ত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী। [ইবনে কাসীর] অন্য বর্ণনায় ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে এসেছে, ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করা হল আর আদমকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু তিনি জান্নাতে একাকীত্ব অনুভব করতে থাকলেন। তারপর তার ঘুম আসল, সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার পাশে একজন মহিলা বসে আছেন, যাকে তার পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? বললেন, মহিলা। আদম বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? বললেন, যাতে তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ কর। তখন ফেরেশতাগণ তাকে প্রশ্ন করলেন: হে আদম! এর নাম কি? আদম বললেন, হাওয়া। তারা বলল, তাকে হাওয়া কেন নাম দেয়া হল? তিনি বললেন, কেননা তাকে জীবিত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর] এর সমর্থনে আমরা একটি হাদীস পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে, উপরিভাগ। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ কর। [বুখারী: ৩৩৩১, মুসলিম: ১৪৬৮] হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক থেকে উপরোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন।

مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এবং যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করুন, কিন্তু এই গাছটির কাছে যাবেন না[১]; তাহলে আপনারা হবেন যালিমদের[২] অন্তর্ভুক্ত' ।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

৩৬. অতঃপর শয়তান সেখান থেকে

(১) কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কুরআনুল কারীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

(২) যালিম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলুম' বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালিম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমতঃ সে আল্লাহ্র অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে হবে, এটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার। দ্বিতীয়তঃ এ নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে। তার দেহের অংগ-প্রত্যংগ, স্নায়ুমণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ এবং যে জিনিষগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে-এদের সবার তার উপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের উপর যুলুম করে। তৃতীয়তঃ তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার উপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহ্র শাস্তি লাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে ব্যক্তি সত্তার উপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গোনাহ্' শব্দটির জন্য যুলুম এবং 'গোনাহ্গার' শব্দের জন্য যালিম ব্যবহার করা হয়েছে।

فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

তাদের পদস্খলন ঘটালো(১) এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল(২)। আর আমরা বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও; এবং কিছু দিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল যমীনে'।

(১) زَلَّةٌ শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস্ সালামকে পদস্খলিত করেছিল বা তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কুরআনের এসব শব্দে পরিস্কার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম লংঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন। এ বর্ণনার দ্বারা বোঝা গেল যে, আদম 'আলাইহিস্ সালামকে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এরপরও আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, এখানে কয়েকটি ব্যাপারে আলেমদের ইজমা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছেঃ

১) নবীগণ উম্মতের নিকট আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছানোর ব্যাপারে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি বা পাপ হতে মুক্ত।

২) অনুরূপভাবে মর্যাদাহানিকর নিম্নমানের কর্মকাণ্ড থেকেও মুক্ত।

৩) তাদের দ্বারা মর্যাদাহানিকর নয় এমন সগীরা গোনাহ্ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন প্রকার গোনাহ্ বা ভুলের উপর অবস্থান করতে দেননা। অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাদেরকে সাবধান করা হয়, যাতে তারা তাওবা করে সংশোধন করে নেন। ফলে তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সূর্য যে দিনগুলোতে উদিত হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এ দিনই তাকে জান্নাতে থেকে বের করা হয়েছে।" [মুসলিম: ৮৫৪] এখানে এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম 'আলাইহিস্ সালামকে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করলো? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারপর আদম(১) তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন(২)। অতঃপর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন(৩)।

(১) আদম 'আলাইহিস্ সালাম চরমভাবে বিচলিত হলেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রভূর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি করুণা করলেন। অর্থাৎ তাদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল - যেমন, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশ্‌তা ও জ্বিন জাতির মাঝামাঝি এক নতুন জাতি - 'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শর'য়ী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরী'আতী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

(২) যেসব বাক্য আদম 'আলাইহিস্ সালামকে তাওবার উদ্দেশ্যে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ "হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২৩] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তাওবার এই বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন আদম 'আলাইহিস্ সালাম যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে তা গ্রহণ করলেন।

(৩) (তাওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তাওবার সম্বন্ধ মানুষের সংগে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি:- এক. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দুই. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। তিন. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। আর যদি পাপ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা ফেরৎ দেয়া বা তার থেকে মাফ নিয়ে নেয়া।
এ বিষয়গুলোর যেকোন একটির অভাব থাকলে তাওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তাওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। আয়াতে বর্ণিত ﴿تَابَ عَلَيْهِ﴾ এর মধ্যে তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সাথে। এর অর্থ তাওবা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা

নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩৮. আমরা বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]'।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৯. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে[২] মিথ্যারোপ

ছাড়া অন্য কেউ নয়। ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র নিকটও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলিমও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। তারা কোন কোন পীরের কাছে তাওবা করে এবং মনে করে যে, পীর মাধ্যম হয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার পাপ মোচন করিয়ে নেবেন। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না।

(১) خَوْفٌ এর অর্থ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম। আর حُزْنٌ বলা হয়, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রিভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। এ আয়াতে আসমানী হিদায়াতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

(২) আরবীতে "আয়াত" এর আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ বিশ্ব জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কোথাও নবী-রাসূলগণ যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত। কারণ এ নবী-রাসূলগণ যে এ বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভূর প্রতিনিধি এ মু'জিযাগুলো ছিল আসলে

করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে(১)।

৪০. হে ইস্‌রাঈল(২) বংশধরগণ(৩)! তোমরা আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি(৪) এবং

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٤٠

তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ, এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এ গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর যারা জাহান্নামবাসী হিসেবে সেখানকার অধিবাসী হবে, তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না"। [মুসলিম: ১৮৫] অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা সেখানে স্থায়ী হবে। সুতরাং তাদের জাহান্নামও স্থায়ী।

(২) 'ইসরাঈল' ইয়া'কূব 'আলাইহিস্ সালামের অপর নাম। ইয়া'কূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর দু'টি নাম রয়েছে, ইয়া'কূব ও ইসরাঈল।

(৩) এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুস্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। এরপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনাপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তিপর্বেও সেগুলোরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) বনী ইসরাঈলকে যে সমস্ত নে'আমত প্রদান করা হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ফের'আউন থেকে নাজাত, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, তীহ ময়দানে মেঘ দিয়ে ছায়া প্রদান, মান্না ও সালওয়া নাযিলকরণ, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর[১], আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾

৪১. আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতাপ্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না[২]। আর

হিদায়াতের জন্য অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও তৎকালীন বিশ্বের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও উল্লেখযোগ্য।

(১) এ আয়াতে ইসরাঈল-বংশধরগণকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা আমার অংগীকার পূরণ কর"। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অংগীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। কাতাদাহ্ -এর মতে তাওরাতে বর্ণিত সে অংগীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল-বংশধর থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মাঝে থেকে বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ১২] সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংগীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সালাত, যাকাত এবং মৌলিক ইবাদতও এ অংগীকারভূক্ত। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন যে, এ অংগীকারের মূল অর্থ মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অংগীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লংঘন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'অংগীকার ভংগকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অংগীকার ভংগকারীদের পিছনে নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অংগীকার ভংগ করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে'। [সহীহ্ মুসলিম: ১৭৩৮] এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

৪২. আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না[১] এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না[২]।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

হওয়ার অর্থ হলো, মানুষের মর্জি ও স্বার্থের বিনিময়ে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। এ কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

(১) কাতাদাহ ও হাসান বলেন, 'হককে বাতিলের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ো না' এর অর্থ ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদকে ইসলামের সাথে এক করে দেখবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে, ইসলাম। আর ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদ (খৃষ্টবাদ) হচ্ছে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়। সেটি কখনো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। সুতরাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মকে একাকার করে এক ধর্মে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়াহ্ বলেন, এর অর্থ তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের কাছে নসীহত পূর্ণ কর। অর্থাৎ তোমাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে বর্ণনা কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, তারা যে হককে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে। আর যে বাতিলকে হকের সাথে মিশিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের সাথে কুফরী করেছে এবং তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত গুণাগুণসহ অনুরূপ যা কিছু তারা গোপন করেছে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এর বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছুর উপর ঈমান আন, আর কিছুর সাথে কুফরী কর" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৫] এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মাদ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সম্পর্কে যে জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে তা গোপন কর না। অথচ তার সম্পর্কে তোমরা তোমাদের কাছে যে গ্রন্থ আছে তাতে নিশ্চিতভাবেই অনেক কিছু পাচ্ছ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ বলেন, আহলে কিতাবগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপন করে থাকে। অথচ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর(১)।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও(২)!

তারা তার ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। [তাবারী] এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

(১) হাসান বলেন, 'সালাত এমন এক ফরয যা না পাওয়া গেলে অন্য কোন আমলই কবুল করা হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতও।' [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে বর্ণিত 'রুকূ' এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজ্‌দার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা সালাতের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, 'রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর'। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সালাতের সমগ্র অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে সালাতের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় ﴿وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ﴾ 'ফজর সালাতের কুরআন পাঠ' বলে সম্পূর্ণ ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়াতে 'সিজ্‌দা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা'আত বা গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, সালাত আদায়কারীগণের সাথে সালাত আদায় কর। অর্থাৎ 'রুকূ'কারীদের সাথে' শব্দদ্বয়ের দ্বারা জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। এতে বুঝা যায় ইয়াহূদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করতো। কিন্তু নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। মূলতঃ তারাই অপরকে পুণ্য ও মংগলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্‌বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্

وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর[১]। আর নিশ্চয় তা

সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিব্‌রাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী - যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১২০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'কিছুসংখ্যক জান্নাতবাসী অপর কিছুসংখ্যক জাহান্নামবাসীদেরকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? জাহান্নামবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না'। [বুখারীঃ ৩২৬৭, মুসলিমঃ ২৯৮৯]

(১) মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ 'সবর' এর তাফসীর করেছেন 'সাওম"। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, ধৈর্য্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট বিষয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এক সময় তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে এবং সে সফলকাম হবে। কিন্তু সালাতের মাধ্যমে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করবে? এর উত্তর হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লিল কাজ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫] এটা নিশ্চয় এক বিরাট সাহায্য। তাছাড়া সালাতের মাধ্যমে রিযকের মধ্যে প্রশস্তি আসে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন, আমরা আপনার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমরাই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াতেই নিহিত।" [সূরা ত্বা-হা: ১৩২] আর এ জন্যই "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন"। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮] সুতরাং যে কোন বিপদাপদে ও সমস্যায় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কটা তাজা করে নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যেতে পারে। সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ থেকে এ ব্যাপারে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট তার ভাই 'কুছাম' এর মৃত্যুর খবর পৌঁছল, তিনি তখন সফর অবস্থায় ছিলেন। তিনি তার বাহন থেকে নেমে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় পড়লে একবার এমনভাবে বেহুশ হয়ে যান যে সবাই ধারণা করে বসেছিল যে, তিনি বুঝি মারাই গেছেন। তখন তার স্ত্রী উম্মে

বিনয়ীরা ছাড়া[১] অন্যদের উপর কঠিন।

الْخٰشِعِيْنَ ۙ

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রব-এর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে[২]।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۧ

৪৭. হে ইস্‌রাঈল বংশধরগণ! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। আর

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

কুলসুম মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬৯]

(১) কুরআন ও সুন্নায় যেখানে خُشُوْعٌ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে 'ইবাদাত সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে'। ইব্‌রাহীম নখয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকাই বিনয় নয়'। خُشُوْعٌ বা বিনয় অর্থ 'অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া।' সারকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

(২) আয়াতে বর্ণিত ظَنٌّ শব্দটির অর্থ, মনে করা বা ধারনা করা। কিন্তু মুজাহিদ বলেন, কুরআনে যেখানে ظَنٌّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই 'নিশ্চিত জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী, ইবনে কাসীর] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হলেও সবস্থানেই যে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়, যেমন, সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৪, সূরা আল-বাকারাহ: ৭৮, সূরা আন-নিসা: ১৫৭, সূরা আল-আন'আম:১১৬। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে এখানে সমস্ত মুফাসসিরের মতেই ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

নিশ্চয় আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম(১)।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তোমরা সে দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না(২)। আর কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না(৩)

(১) কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, তাদেরকে তৎকালীন সময়ের সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। [তাফসীর আব্দুর রাজ্জাক, তাবারী] তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়াদি সম্পর্কে আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদেরকে রাজত্ব, রাসূল, কিতাব ইত্যাদি দিয়ে ঐ সময়কার সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বলতে হবে। কারণ, এ উম্মত অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাদের থেকেও উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। আহ্লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করবে। তন্মধ্যে তোমরা হচ্ছ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানিত"। [ইবনে মাজাহ: ৪২৮৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩]

(২) অর্থাৎ কেউ অপর কারও পক্ষ থেকে কোন কিছু আদায় করবে না। [তাবারী] যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না" [সূরা লুকমান: ৩৩] তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে রহমত করুন, যার কাছে তার কোন ভাইয়ের কোন ইযযত আবরুর উপর হামলা জনিত যুলুম, অথবা তার সম্পদ ও সম্মানের উপর আঘাত ছিল, তারপর সে সেটা থেকে নিজেকে বিমুক্ত করতে পেরেছে, ঐ দিনের পূর্বেই যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। বরং যদি তার কোন নেকী থাকে তবে তা থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে তার উপর মাযলুমের পাপসমূহ চাপিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী: ৬৫৩৪]

(৩) আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, আখেরাতে শাফা'আত বা সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। মূলত: ব্যাপারটি এরকম নয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু কাফের-মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ কাজে

এবং কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না[১]।

আসবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যার উপর সন্তুষ্ট নয় তার জন্য তারা সুপারিশ করবে না"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৮] আল্লাহ্ কাদের উপর সন্তুষ্ট নয় তা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন।" [সূরা আয-যুমারঃ৭] সুতরাং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ নয়। আর কাফেররাও হাশরের দিন স্বীকৃতি দিবে যে, তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই, তারা বলবে "আমাদের তো কোন সুপারিশকারী নেই" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ১০০] তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন, "সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকার দিবে না"। [সূরা আল-মুদ্দাসসিরঃ৪৮] এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা কুফরী, শির্কী, নিফাকী অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ নেই।

পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ অবশ্যই হবে। যা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাদের জন্য সুপারিশের ব্যাপারেও শর্ত হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট থাকতে হবে। মূলতঃ এ ঈমানের কারণেই শাফা'আত তথা সুপারিশের হকদার হয়েছে। যার সামান্যতম ঈমান আছে তার উপর আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার জন্য আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি হলেও থাকতে হবে। যদিও অন্য অপরাধের কারণে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে নি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, শাফা'আত বা সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করে?" [সূরা আল-বাকারাহঃ২৫৫] তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যিনি সুপারিশ করবেন তার উপরও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশ্তা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট" [সূরা আন-নাজমঃ ২৬] অর্থাৎ যিনি সুপারিশ করবেন তার কথা-বার্তা ও সুপারিশ আল্লাহ্র মনঃপুত হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৯] এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে নবী-রাসূল, শহীদগণ ও নেককার মুমিনগণ শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। যা বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

(১) আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কেয়ামতের দিন। সাধারণতঃ মানুষের কোন শাস্তির হুকুম হলে তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নিম্নলিখিত চারটি উপায় অবলম্বন করেঃ

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ফির'আউনের বংশ হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রদের যবেহ করে ও তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখত(১)।

১) একজনের পরিবর্তে অন্যজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে "কেউ কারো পক্ষ থেকে আদায় করে না" বলে কেয়ামতের দিন এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

২) অথবা, একজনের জন্য অপরজন সুপারিশ করে শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্ভাবনাও নাকচ করে বলেনঃ "কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না"।

৩) অথবা, বিনিময় আদায়ের মাধ্যমে কেউ কেউ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে বিনিময় দু'ধরনের হতে পারে, ক) অন্যের কাছ থেকে কিছু সওয়াব লাভ করে তার বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। খ) টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা "কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না", এ কথা বলে এমন সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন।

৪) অথবা, শাস্তির হুকুমের বিপরীতে অপরাধীকে সাহায্যকারী দল থাকে, যারা তাকে তা না মানতে বা তার শাস্তি লাঘব করতে সাহায্য করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা "আর তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না" এ কথা দ্বারা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, তারা ঈমান আনেনি। কিন্তু যদি তাদের ঈমান থাকত তবে শর্ত সাপেক্ষে এ চারটির কোন কোনটি কাজে আসত। মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত আখেরাতে সেগুলোর কোনটাই কার্যকর হবে না।

(১) কোন ব্যক্তি ফির'আউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফির'আউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। এত বড় নে'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ নবীগণ কি করেছেন? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা আগমন করলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা মহররমের দশ তারিখের সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে বললেন,

আর এতে ছিল তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা(১);

৫০. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম(২) এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির'আউনের বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আর তোমরা তা দেখছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝٥٠

৫১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গিকার করেছিলাম(৩), তার (চলে যাওয়ার) পর তোমরা গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে)

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝٥١

ব্যাপারটি কি? তারা বলল: এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, ফলে মূসা আলাইহিস সালাম এ দিন সাওম পালন করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে মূসার বেশী হকদার, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিনের সাওম পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন।" [বুখারী: ২০০৪, মুসলিম: ১২৮]

(১) অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে بلاء শব্দের অর্থ, নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে। তখন উদ্দেশ্য হবে, তাদের নাজাত ছিল এক বড় নেয়ামত। [তাবারী]

(২) এখানে কিভাবে ফির'আউনের হাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন। অন্য আয়াতে এসেছে, "আর অবশ্যই আমি মূসাকে ওহী করে বলেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতেই চলে যান" [ত্বাহা: ৭৭, আশ-শু'আরা:৫২] যাওয়ার পথে তার সামনে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে বললেন, "আপনি সমুদ্রকে লাঠি দিয়ে আঘাত করুন, ফলে তা ভাগ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩] আর এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র ভাগ করে দিলেন।

(৩) এখানে চল্লিশ রাতের ব্যাপারে এটা বলেন নি যে, এ চল্লিশ রাতের ওয়াদা প্রথমেই নিয়েছিলেন কি না? কিন্তু অন্যত্র বলে দিয়েছেন যে, তাকে প্রথমে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন তারপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে দিয়ে তা চল্লিশে পূর্ণ করে দিলেন। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪২]

গ্রহণ করেছিলে(১); আর তোমরা হয়ে গেলে যালিম(২) ।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. এর পরও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

৫৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও 'ফুরকান(৩)' দান

(১) এখানে গো বৎসের উৎস ও কারিগর সম্পর্কে কিছু বলেন নি । অন্যত্র সেটা বিস্তারিত এসেছে । আল্লাহ্ বলেন, "মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত । তারা কি দেখল না যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা ওটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৮] আরও বলেন, "তারা বলল, 'আমরা আপনাকে দেয়া অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি ; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে । 'তারপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত ।' তারা বলল, 'এ তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে ।'" [সূরা ত্বা-হা: ৮৭-৮৮]

(২) এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফির'আউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর ইসরাঈল-বংশধররা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল, আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল । তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর খেদমতে ইসরাঈল-বংশধররা আরয করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত । যদি আমাদের জন্য কোন শরী'আত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অংগীকার প্রদান করলেন যে, আপনি তূর পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার পর আপনাকে এক কিতাব দান করবো । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তাই করলেন । এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে অতিরিক্ত আরও দশদিন 'ইবাদাত করতে নির্দেশ দিলেন । এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তাওরাত দিলেন । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি শব্দ করতে থাকলো । আর ইসরাঈল-বংশধররা তারই পূজা করতে শুরু করে দিল । [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) 'ফুরকান' দ্বারা হয়ত তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরী'আতী বিধানমালাকে বুঝানো হয়েছে ।

করেছিলাম; যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।

تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপন জাতির লোকদের বললেন, 'হে আমার জাতি! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তাওবা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৫. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না,' ফলে তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আর আমরা মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

কেননা, শরী'আতের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে- যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা ফুরকানের মানে হচ্ছে দ্বীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি, যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অথবা স্বয়ং তাওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

নিকট 'মান্না' ও 'সাল্ওয়া[১]' প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম), 'আহার কর উত্তম জীবিকা, যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি'। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করেছিল।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর স্মরণ কর, যখন আমরা বললাম, এই জনপদে প্রবেশ করে তা হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলঃ 'ক্ষমা চাই'। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। অচিরেই আমরা মুহসীনদেরকে বাড়িয়ে দেব।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. কিন্তু যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম[২]।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন। আমরা বললাম,

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ

(১) ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর প্রেরিত আসমানী খাবার। যা গাছের উপরে কুয়াসার ন্যায় জমা হয়ে থাকত। এ সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল-কামআ' [এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অনেকটা মাশরুমের মত] মান্না এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর পানি চোখের আরোগ্য'। [বুখারীঃ ৪৪৭৮] আর 'সালওয়া' হলো এক প্রকার পাখি, যা চড়ুই পাখি থেকে আকারে একটু বড়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহামারী এমন একটি রোগ যা বনী ইসরাঈলের উপর অথবা তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর আকাশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা কোথাও এর সংবাদ কোথাও শুনতে পাবে তখন সেখানে যাবে না। আর তোমরা যেখানে থাক সেখানে নাযিল হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।" [বুখারী: ৩৪৭৩, মুসলিম: ২২১৮]

الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

'আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন'। ফলে তা হতে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (বললাম,) 'আল্লাহ্‌র দেয়া জীবিকা হতে তোমরা খাও, পান কর এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না'।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার রব-এর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর---তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্‌জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। মূসা বললেন, 'তোমরা কি উত্তম জিনিষের বদলে নিম্নমানের জিনিষ চাও? তবে কোন শহরে চলে যাও, তোমরা যা চাও, সেখানে তা আছে'(১)। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হল। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে

(১) তীহ্ উপত্যকায় 'মান্না' ও 'সালওয়া'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব শব্জী ও শস্যের জন্য আবেদন করলো। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগের নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন, বলা হয়েছে- ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ 'আর সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার রব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইয়াহূদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে'। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৭]

অন্যায়ভাবে হত্যা করত[১]। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল[২]।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে[৩] এবং নাসারা[৪] ও সাবি'ঈরা[৫] যারাই আল্লাহ্ ও শেষ

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আযাব হবে সে লোকের যাকে কোন নবী হত্যা করেছে, অথবা কোন নবীকে হত্যা করেছে। আর ভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা এবং ভাস্কর্য নির্মাণকারী।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪১৩,৪১৫]

(২) কাতাদাই এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ; কেননা পূর্বেকার লোকেরা এ দু'টির কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) তাদেরকে ইয়াহূদী নামকরণ তারা নিজেরাই করেছিল। কারও কারও মতে ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের পুত্র 'ইয়াহূদা' এর নামানুসারে তাদের এ নাম দেয়া হয়েছিল। অপর কারও কারও মতে, 'হাওদ' শব্দের অর্থ ঝুঁকে যাওয়া। তারা তাওরাত পাঠের সময় সামনে-পিছনে ঝুঁকে যেত বলে তাদের এ নাম হয়েছে। অথবা 'হাওদ' এর অর্থ ফিরে আসা। তারা বলেছিল ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ "আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৬] সে অনুসারে তাদের নাম হয়েছে, ইয়াহূদ। পবিত্র কুরআনে যেখানেই তাদেরকে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই তাদের খারাপ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইয়াহূদী নামটি কোন ভাল গুণবাচক নাম নয়।

(৪) কাতাদাহ্ বলেন, তাদেরকে নাসারা নামকরণ করা হয়েছে, কেননা তারা 'নাসেরাহ' নামক এক গ্রামের অধিবাসী ছিল যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের কাছে এসেছিলেন। এ নামে তারা নিজেদেরকে নামকরণ করেছিল। তাদেরকে এ নাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দেন নি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৫) সাবে'ঈন কারা এ নিয়ে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ইয়াহূদী-নাসারা এবং অগ্নি-উপাসকদের মাঝামাঝি একটি জাতি। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট দ্বীন নেই। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ফেরেশ্তা-উপাসক জাতি। তারা কেবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে। রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের অনুসরণ করে চলত। বস্তুতঃ সাবে'ঈনরা এক বিরাট জাতি, যাদের অস্তিত্ব ইরাক থেকে শুরু করে পূর্ব দিকের দেশগুলোতে দেখা যায়। বর্তমানেও ইরাকে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের কিছু 'ইবাদাত, যেমনঃ অযু, সালাত, কেবলা, সাওম ইত্যাদি প্রায় মুসলিমদের মতই। কিন্তু, আকীদাগতভাবে তারা দু'ভাগে বিভক্ত।

صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব-এর কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম[২] এবং তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম 'তুর' পর্বত; (বলেছিলাম,) 'আমরা যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে[৩] তা

(এক) যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে। কিন্তু তারা কোন রাসূলের অনুসরণ করে না। (দুই) যারা তারকা-পূজারী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি তারকার প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি ঈমান ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলিম হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। আয়াতে ﴿وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾ বা "সৎকাজ করে" এটুকু বলার মাধ্যমে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার দ্বারাই তাদের নাজাত পাওয়া সীমাবদ্ধ এটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কারণ, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ না করা হয়, তবে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যার অর্থ এই যে, যে মুসলিম হবে, সে-ই আখেরাতে নাজাতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজুস এ সমস্ত লোকদের এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরও কেউ যদি মুসলিম হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, এ অঙ্গীকার ছিল, নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহ্ ইবাদত করা। আর কারও ইবাদত না করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর সাথে সাথে অঙ্গীকারের অন্যান্য বিষয়াবলী আয়াতের শেষেই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত بِقُوَّةٍ এর তাফসীর কেউ করেছেন, দৃঢ়তার সাথে। কাতাদাহ করেছেন, গুরুত্বের সাথে। আবুল আলীয়াহ বলেছেন, আনুগত্যের সাথে। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর উপর আমল করার স্বীকারোক্তির সাথে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার[১]' ।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এরপরও তোমরা মুখ ফিরালে! অতঃপর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে[২] ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে

(১) যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তূর পর্বতে তাওরাত প্রদান করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা ইসরাঈল-বংশধরকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন । এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল - কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল । এ সম্পর্কে প্রথম তারা এ কথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তখনই আমরা মেনে নেবো । (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা যে সত্তরজন লোক মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে সাক্ষী দিল । কিন্তু ইসরাঈল-বংশধররা পরিস্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না । ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে হুকুম করলেন, 'তূর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়লো । অবশেষে নিরুপায় হয়ে তা মেনে নিতে হলো । এ আয়াতে বর্ণিত 'তূর পাহাড় উঠানোর' তাফসীর আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে করে দিয়েছেন । যেখানে বলা হয়েছে, "স্মরণ করুন, আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা । তারা মনে করল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে । বললাম, 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওটাতে যা আছে তা স্মরণ কর" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৭১]

(২) এ আয়াতের সম্বোধন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে সমস্ত ইয়াহূদীদের করা হচ্ছে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে উপস্থিত ছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভংগেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের আওতাভুক্ত করে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এরপরও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব নাযিল করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের উপর নাযিল হয়ে থাকত । এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত ।

জেনেছিলে[১]। ফলে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতএব আমরা এটা করেছি তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি[২]। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ[৩]।

(১) আয়াতে বর্ণিত এ ঘটনাটি দাউদ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলেই সংঘটিত হয়। ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। তারা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করতো আর অপর ভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কাতাদাহ্ বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শুকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনতো এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতো। হাদীসে এসেছে, জনৈক সাহাবী একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইয়াহূদী সম্প্রদায়?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন তখন তিনি তাদের অবশিষ্ট বংশধর রাখেন না। বস্তুতঃ বানর ও শূকর পৃথিবীতে তাদের পূর্বেও ছিল'। [মুসলিমঃ ২৬৬৩] সুতরাং বর্তমান বানরদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরের কোন সম্পর্ক নেই। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ] যেমনিভাবে এ ধারণা করারও কোন সুযোগ নেই যে, মানুষ কোন এক সময় বানরের বংশধর ছিল।

(২) এ তাফসীর আবুল আলীয়াহ থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এর অর্থ "আমরা এটাকে তাদের এ ঘটনার পূর্বের গুনাহ এবং এ ঘটনার গোনাহের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করে দিলাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দিলেন।

(৩) এ ঘটনা মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইয়াহূদীরা যে অন্যায় করেছে তোমরা তা করতে

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর স্মরণ কর[১], যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন', তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বললেন, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই '।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে আহ্বান কর তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, সেটা কিরূপ?' মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ বলছেন, সেটা এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী। অতএব তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর'।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক, সেটার রং কি, তা যেন আমাদেরকে বলে দেন'। মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী, উজ্জ্বল গাঢ় রং বিশিষ্ট, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়'।

যেও না। এতে তোমরা ইয়াহূদীদের মত আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা বাহানা করে হালাল করে ফেলবে।" [ইবনে বাত্তাহ: ইবতালুল হিয়াল: ৪৬, ৪৭]

(১) এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ইসরাঈল-বংশধরদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন, আল্লাহ্ তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন। ইসরাঈল-বংশধররা কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না, বরং যেকোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে সমর্থ হয়। তারপর গরু জবাই করার পর মৃতদেহে সে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মারা যায়। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, 'তোমার রবকে আহ্বান কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সেটা কোন্‌টি? নিশ্চয় গাভীটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা নিশ্চয় দিশা পাব'(১)।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۖ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

৭১. মূসা বললেন, 'তিনি বলছেন, সেটা এমন এক গাভী যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। অবশেষে তারা সেটাকে যবেহ্ করল, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিল না ।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে তারপর একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, আর তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা ব্যক্তকারী ।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতঃপর আমরা বললাম, 'এর কোন অংশ দিয়ে তাকে আঘাত কর'। এমনিভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন তাঁর নিদর্শন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার(২)।

(১) ইকরিমাহ বলেন, যদি তারা "আল্লাহ ইচ্ছে করলে" বাক্য না বলত, তবে কখনই সে ধরনের গরু খুঁজে পেত না। [তাবারী]

(২) শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, বনী ইসরাইলের মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম হওয়ার অর্থই জন্মের পরে পুনরুত্থানের প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া। কেননা, যিনি একজনকে মৃত্যুর পরে জীবিত করতে সমর্থ, তিনি অবশ্যই সমস্ত জীবকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ কোন কোন পাথর তো এমন যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর কিছু এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে[১], আর তোমরা যা কর

সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" [সূরা লুকমান: ২৮]

(১) এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছেঃ (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ, (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) নীচে গড়িয়ে পড়া। মুজাহিদ বলেন, এ সবগুলিই আল্লাহ্‌র ভয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, পাথরের উপর যে ক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বাস্তব ঘটনা। প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এটা উহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।" [মুসলিম: ১৩৬৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আমি মক্কায় এক পাথরকে চিনি, যে পাথর আমি নবী হওয়ার পূর্ব হতেই আমাকে সালাম করত, আমি এখনও সেটাকে চিনি।" [মুসলিম: ২২৭৭] তবে পাথরের উপর সংঘটিত উপরোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় ক্রিয়াটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। অর্থাৎ কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তা দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত। কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় বেশী দুর্বল। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী যে, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনো মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে তাদের 'কঠিন হৃদয়' হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়নি। তবে অন্যান্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "সুতরাং তাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের

আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে, অথচ তারা জানে(১)।

হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৩] "আর তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--- অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তর সমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল।" [সূরা আল-হাদীদ:১৬]

(১) এখানে আল্লাহ্র বাণী অর্থ তাওরাত। 'শ্রবণ করা' অর্থ নবীদের মাধ্যমে শ্রবণ করা। 'পরিবর্তন করা' অর্থ কোন কোন বাক্য অথবা তার অর্থ অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লেখিত কোন কুকর্ম যদি সংঘটিত নাও হয়ে থাকে, তবুও পূর্ববর্তীদের এসব দুস্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করতো না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ পূর্ববর্তীদেরই মত। কিন্তু কারা এবং কিভাবে তাদের কিতাবকে বিকৃত করত, তা এখানে বলা হয়নি। মুফাসসিরগণের মধ্যে মুজাহিদ বলেন, এ বিকৃত করা ও গোপন করার কাজটি তাদের আলেম সমাজই করত। আবুল আলীয়াহ্ বলেন, তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে বর্ণিত লোকগুলো হচ্ছে, ইয়াহূদরা। তারা আল্লাহ্র বাণী শুনত; তারপর সেগুলো বুঝে-শুনে বিকৃত করত। তারা আল্লাহ্র বিধানেও পরিবর্তন সাধন করত, হাদীসে এসেছে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল যে, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচার করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা তাওরাতে "রাজ্ম" বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কি কিছু পাও? তারা বলল, আমরা তদেরকে শাস্তি হিসেবে তাদেরকে লজ্জিত করি এবং বেত্রাঘাত করা হবে। অর্থাৎ তারা 'রাজম' অস্বীকার করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে 'রাজম' এর কথা আছে। তখন তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং সেটা মেলে ধরল। তখন তাদের একজন 'রাজম' এর আয়াতের উপর হাত রেখে এর আগে এবং পরের অংশ পড়ল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তারা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আবার যখন তারা গোপনে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন(১); যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রব-এর নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে তোমরা কি বুঝ না(২)?'

তুমি তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, সেখানে 'রাজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন তারা বলল, মুহাম্মদ সত্য বলেছে। এতে 'রজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর 'রজম' করা হলো। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে লোকটি মহিলার উপর বাঁকা হয়ে তাকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। [বুখারী: ৩৬৩৫]

(১) এখানে 'যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন' বলে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুমিনদের সাথে ইয়াহূদীদের সাক্ষাৎ হলে তারা মুমিনদের বলত- আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাসূল। তবে তিনি শুধু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি নয়। আবার শুধু তারা নিজেরা একত্রিত হলে একদল আরেক দলকে বলত- সাবধান! আরবদের কাছে তাও প্রকাশ করো না। কারণ, এর আগে তোমরা এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কথা বলতে। এখন সে-ই তো তাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বলত, এ নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মত যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলিমদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহ্র সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ ইয়াহূদীদের বিশ্বাস এভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন মনে করত, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এজন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, তোমরা কি আল্লাহ্কে বেখবর মনে কর? [ইবনে কাসীর]

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা ব্যক্ত করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন?

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা(১) ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে(২)।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

৭৯. কাজেই দুর্ভোগ(৩) তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে

(১) أَمَانِيَّ শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, মিথ্যা আশা। এ অর্থের পক্ষে অন্যান্য আয়াতও সাক্ষ্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে, "আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এটা তাদের মিথ্যা আশা।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১] আরও এসেছে, "তোমাদের আশা-আকাংখা ও কিতাবীদের আশা-আকাংখা অনুসারে কাজ হবে না" [সূরা আন-নিসা: ১২৩] উপরোক্ত দুই আয়াতেও أَمَانِيَّ শব্দ মিথ্যা আশা-আকাংখা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হচ্ছে, লেখাপড়া না জানা। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আছে যারা কোন লেখা পড়া জানে না। তাদের কাজ হলো অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা। কিন্তুবাক্যের প্রথমে أُمِّيُّونَ শব্দের উল্লেখ থাকায় এ অর্থটি খুব বেশী উপযুক্ত নয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ৭৫-৭৮ আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে, আলেম সম্প্রদায় তাদের কাজ হলো আল্লাহ্র কালাম বিকৃত করা। আরেক দল হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পেশ করে। আরেক শ্রেণী হচ্ছে, জাহেল মূর্খ গোষ্ঠী। তারা পড়ালেখা জানে না। তারা কেবল অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। [ইবনে কাসীর]

(৩) وَيْلٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরে এর অর্থ করা হয়েছে, দূর্ভোগ। এছাড়া এর এক তাফসীর 'আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যদি পাহাড়ও এতে নিয়ে ফেলা হয় তবে তার তাপে তাও মিইয়ে যাবে'। [ইবনুল মুবারকের আয-যুহদ, নং ৩৩২] আবু আইয়াদ আমর ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী বলেন, وَيْلٌ হচ্ছে, জাহান্নামের মূল অংশ থেকে যে পুঁজ বয়ে যাবে তার নাম' [তাবারী] মোটকথা: সব রকমের শাস্তি ও ধ্বংস তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস[১]।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তারা বলে, 'সামান্য কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না'। বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কোন অংগীকার নিয়েছ; যে অংগীকারের বিপরীত আল্লাহ্ কখনও করবেন না? নাকি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?'

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. হ্যাঁ, যে পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'তোমরা কোন ব্যাপারে কিতাবীদেরকে কেন জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে তোমাদের রাসূলের কাছে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র কিতাব। যা সবচেয়ে আধুনিক, (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসার ব্যাপারে) নবীন। তোমরা সেটা পড়ছ। আর সে কিতাবে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা তাদের কিতাবকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বহস্তে সে কিতাব লিপিবদ্ধ করে বলেছে যে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তোমাদের কাছে এ সমস্ত জ্ঞান আসার পরও তা তোমাদেরকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা থেকে নিষেধ করছে না। না, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের একজনকেও দেখিনি যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের কাছে কি নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। [বুখারী: ৭৩৬৩] সুতরাং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছুতেই ইয়াহূদী-নাসারাদের কোন বর্ণনার প্রয়োজন আমাদের নেই।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ইস্‌রাঈল-সন্তানদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা(১), আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রের(২) সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে(৩)। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া(৪)

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার"। বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা"। [বুখারী: ৫২৭, মুসলিম: ৮৫]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মিসকীন সে নয়, যে এক খাবার বা দুই খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় বরং মিসকীন হচ্ছে, যার সামর্থ নেই অথচ সে লজ্জায় কারও কাছে চায় না। অথবা মানুষকে আগলে ধরে কোন কিছু চায় না।" [বুখারী: ১৪৭৬, মুসলিম: ১০৩৯]

(৩) আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলামনে বলবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালাম-কে নবুয়ত দান করে ফির'আউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা উভয়েই ফির'আউনকে নরম কথা বলবে।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৪] আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফির'আউন অপেক্ষা বেশী মন্দ বা পাপিষ্ঠ নয়। সুতরাং সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত। হাদীসে এসেছে, "তোমরা সৎকাজের সামান্যতম কিছুকে খাটো করে দেখ না। যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা।" [মুসলিম: ২৬২৬] তাছাড়া মানুষের সাথে সদালাপের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, তা হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) 'অল্প কয়েকজন' অর্থ, তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত

তোমরা সকলেই অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছ।

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তারপর তোমরাই তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করছ তাদের উপর অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা। আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও(১); অথচ তাদেরকে

রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম প্রবর্তিত শরী'আতের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরী'আতের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, সালাত আদায় করা ও যাকাত দেয়া ইসলামী শরী'আতসহ পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহেও ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেগুলো ত্যাগ করে।

(১) ইসরাঈল-বংশধরকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনোখুনী না করা, দ্বিতীয়তঃ বহিস্কার অর্থাৎ দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ স্বগোত্রের কেউ কারো হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আউস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইয়াহূদীদের দু'টি গোত্র 'বনী-কুরাইযা' ও 'বনী-নাদীর' বসবাস করত। আউস গোত্র ছিল বনী-কুরাইযার মিত্র এবং খাযরাজ ছিল বনী-নাদীরের মিত্র। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে

বহিস্কার করাই তোমাদের উপর হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তারাই সে লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে; কাজেই তাদের শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴿٨٧﴾

৮৭. অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি এবং আমরা মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি[১] এবং

মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কুরাইযা সাহায্য করত এবং নাযীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আউস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী-নাদীরেরও তেমনি হত। বনী কুরাইযাকে হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-নাদীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাদীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-কুরাইযারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইয়াহূদীদের দুই দলের কেউ আউস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইয়াহূদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলতঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরনেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে ‘স্পষ্ট প্রমাণ’ কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। তবে অন্য জায়গায় সেটা

بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

'রূহুল কুদুস'(১) দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮৮. আর তারা বলেছিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত', বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে যা আছে আল্লাহ্র কাছ থেকে তার সত্যায়নকারী(২)

বলা হয়েছে, যেমন, "আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।" [সূরা আলে ইমরান: ৪৯]

(১) কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে 'রূহুল কুদুস' বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আশ-শু'আরা: ১৯৩, সূরা মারইয়াম: ১৭।

(২) এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, তারা তাকে জানতে ও চিনতে পেরেছে। তার সপক্ষে বহু তথ্য-প্রমাণ সে যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইয়াহূদী আলেমের মেয়ে এবং আরেকজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা আগমনের পর আমার বাবা ও চাচা দু'জনেই তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনিঃ চাচা বললেন, আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে, ইনি কি সত্যিই সেই নবী? পিতা বললেন, আল্লাহ্র কসম, ইনিই সেই নবী।

لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

কিতাব আসলো; অথচ পূর্বে তারা এর সাহায্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তারপর তারা যা চিনত যখন তা তাদের কাছে আসল, তখন তারা সেটার সাথে কুফরী করল(১)। কাজেই কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯০. যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজদেরকে বিক্রি করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট! তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তার সাথে কুফরী করেছে, হটকারিতাবশতঃ শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ নাযিল করেন।

চাচা বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? পিতা বললেন, হ্যাঁ। চাচা বললেন, তাহলে এখন কি করতে চাও? বাবা বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাব। [দালায়েলুন নাবুওয়াহ লিল বাইহাকী, সীরাতে ইবনে হিসাম]

(১) নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমণের পূর্বে ইয়াহূদীরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমনবার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দো'আ করত তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইয়াহূদী জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইয়াহূদী সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করত, মদীনাবাসীরা নিজেরাই এর সাক্ষী। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতঃ ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের উপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালিমদের সবাইকে দেখে নেব। মদীনাবাসীরা এসব কথা আগের থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ দেখ, ইয়াহূদীরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এ নবীর দ্বীন গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চল, তাদের আগে আমরাই এ নবীর উপর ঈমান আনব। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, যে ইয়াহূদীরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তার সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হল। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৬৭, তাফসীর ইবনে কাসীর]

কাজেই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে[১]। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি[২]।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি'। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র

(১) এখানে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়। তবে ইকরিমাহ বলেন, তাদের উপর এক ক্রোধ হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালামের উপর কুফরী করার কারণে, আর অন্য ক্রোধ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুফরীর কারণে। তাছাড়া শাস্তির সাথে অপমানজনক পদ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির আরেক কারণ হচ্ছে, তাদের অহঙ্কার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সুরতে পিপড়ার মত করে জমায়েত করা হবে। ছোট সব কিছুই তাদের উপর থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামের এক কয়েদখানায় প্রবিষ্ট করানো হবে যার নাম হচ্ছে, বুলস। যাবতীয় আগুন তাদের উপরে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামবাসীদের পুঁজ 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করানো হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৯]

(২) আয়াতে উল্লেখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলেই মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভংগের অপরাধে বনী-কুরাইযা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নাদীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

নবীদেরকে হত্যা করেছিলে[১]?'

৯২. অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ[২] এসেছিলেন,

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

(১) 'আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,' ইয়াহূদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'। - এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র সকল গ্রন্থের মতেই নবীদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরী করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তির দ্বারা ইয়াহূদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে 'স্পষ্ট প্রমাণ' কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটা এসেছে। যেমন, বলা হয়েছে, " তারপর আমরা তাদেরকে তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা অহংকারীই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩৩] আরও বলা হয়েছে, "তারপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল" [সূরা আল-আ'রাফ: ১০৭-১০৮] আরও এসেছে, "তারপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল" [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩] অনুরূপ আরও কিছু আয়াতে।

তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা যালিম[১]।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) 'যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শোন'। তারা বলেছিল, 'আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম'। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বলুন, 'যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!'

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪. বলুন, 'যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'।

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।

---

(১) ইয়াহূদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শির্কে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও । তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত; অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিস্কৃতি দিতে পারবে না । তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. বলুন, ‘যে কেউ জিব্‌রীলের[১] শত্রু হবে, এজন্যে যে, তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ’[২] ।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘জিবরীল’ শব্দটি আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এর মতই । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ এই বলা হয় যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, যদি সেগুলোর জবাব আপনি দিতে পারেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দিব এবং আপনার উপর ঈমান আনব । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যেমন ইয়া‘কুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তিনি বলেন, “আমরা যা বলছি তাতে আল্লাহ্ই কর্মবিধায়ক” [সূরা ইউসুফ:৬৬] তখন তারা বলল, আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলামত কি বলুন । রাসূল বললেন, “তার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না” । তারা বলল, কিভাবে একজন নারী মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় আর কিভাবে পুরুষ সন্তানের জন্ম দেয়? রাসূল বললেন, দুই বীর্য মিলিত হওয়ার পরে যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের চেয়ে বেশী প্রাধান্য বিস্তারকারী হয় তবে মেয়ে সন্তান হয় । আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে পুত্র সন্তান হয় । তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন । ---- তারা বলল, ইসরাঈল (ইয়াকুব) কোন

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٩٨

৯৮. 'যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের শত্রু(১)' ।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۝٩٩

৯৯. আর অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না ।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ

১০০. এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোন অংগীকার করেছে তখনই তাদের

বস্তুকে তার নিজের উপর হারাম করেছেন সেটা আমাদের জানান। তিনি বললেন, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বেদুইন এলাকায় বাস করতেন। তখন তার 'ইরকুন নিসা' নামক রোগ হয়। ফলে তিনি দেখলেন যে, উটের গোস্ত ও দুধ তার জন্য এ রোগের কারণ হয়েছে, তখন তিনি সেটা নিজের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা বলল, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে তার সম্পর্কে আমাদের জানান। কেননা, প্রত্যেক নবীর কাছেই কোন না কোন ফেরেশতা তার রবের কাছ থেকে ওহী ও রিসালত নিয়ে আগমন করে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গীটি কে? এটি বাকী রয়েছে। যদি এটা বলেন তো আমরা আপনার অনুসরণ করব। রাসূল বললেন, তিনি তো জিবরীল। তারা বলল, এই তো সে যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে আসে। সে ফেরেশ্তাদের মধ্যে আমাদের শত্রু। আপনি যদি বলতেন যে, তিনি মীকাইল, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। কারণ তিনি বৃষ্টি ও রহমত নিয়ে আসে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪, তিরমিযী: ৩১১৭] আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে; সে শুধু এজন্যই শত্রু হবে যে, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে যার উপর ইচ্ছা ওহী নিয়ে অবতরণ করে থাকেন। যারা আল্লাহ্র ফেরেশতা ও তার বিধানের বিরোধিতার জন্য জিবরীলের সাথে শত্রুতা করবে তার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা ফেরেশ্তাদের উপর ঈমান আনবে না তারা কাফের। ফেরেশ্তারা হলো নূরের তৈরী। যারা কোন অপরাধ করে না। তারা আগবাড়িয়ে কিছু করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাই শুধু তারা পালন করে। সুতরাং যারা ফেরেশ্তাদের সাথে শত্রুতা করে, তারা মূলতঃ আল্লাহ্র সাথেই শত্রুতা করল।

কোন এক দল তা ছুঁড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না'(১)।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

(১) জাদু এমন এক বিষয়কে বলা হয়, যার উপকরণ নিতান্ত গোপন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। জাদু এমন সব গোপনীয় কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। জাদুর মধ্যে মন্ত্রপাঠ, ঝাড়ফুঁক, বাণী উচ্চারণ, ঔষধপত্র ও ধুম্রজাল - এসব কিছুর সমাহার থাকে। জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। ফলে মানুষ কখনো এর মাধ্যমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয় এবং এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করা যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া তাকদীরের নির্ধারিত হুকুম ও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ। এ প্রকার কাজ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। দু'টি কারণে জাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (এক) এতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়। তাদের

তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ

সাথে সম্পর্ক রাখা হয় এবং তাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়। (দুই) এতে গায়েবী ইলম ও তাতে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক হবার দাবী করা হয়। আবার কখনো কখনো জাদুকরকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। এ সবগুলোই মূলতঃ ভ্রষ্টতা ও কুফরী। তাই কুরআনুল কারীমে জাদুকে সরাসরি কুফরী-কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্যঃ নবীগণের মু'জিযা দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

নবীগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। নবীগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নবীগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। [দেখুন, বুখারীঃ ৩২৬৮, মুসলিমঃ ২১৮৯] তাছাড়া, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এরও জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ঘটনা কুরআনেই উল্লেখিত রয়েছে ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ এবং ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [ত্বাহাঃ ৬৬-৬৭] জাদুর কারণেই মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

ঘটাতো[১]। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত সওয়াব নিশ্চিতভাবে (তাদের জন্য) অধিক কল্যাণকর হত, যদি তারা জানত!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

১০৪. হে মুমিনগণ! তোমরা 'রা'এনা'[২]

(১) এ ব্যাপারে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইবলীস তার চেয়ারটি পানির উপর স্থাপন করে। তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। যে যত বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারবে তার কাছে তার মর্যাদা তত নৈকট্যপূর্ণ। তার বাহিনীর কেউ এসে বলে যে, আমি এই এই করেছি, সে বলে যে, তুমি কিছুই করনি। তারপর আরেক জন এসে বলে যে, আমি এক লোককে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কচ্যুতি না ঘটিয়েছি ততক্ষণ তাকে ছাড়িনি। তখন শয়তান তাকে তার কাছে স্থান দেয় এবং বলে, হ্যাঁ, তুমি।" অর্থাৎ তুমি একটা বিরাট করে এসেছ। [মুসলিম: ২৮১৩]

(২) رَاعِنَا বা 'রা'এনা' শব্দটি আরবী ভাষায় নির্দেশসূচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন'। সাহাবাগণ এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। কিন্তু এ শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় এক প্রকার গালি ছিল, যা দ্বারা বুঝা হতো বিবেক বিকৃত লোক। তারা এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে উপহাসসূচক ব্যবহার করত। মুমিনরা এ ব্যাপারটি উপলব্ধি না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ব্যবহার করা শুরু করে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে আয়াত

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

বলো না, বরং 'উনযুরনা'(১) বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১০৫. কিতাবীদের(২) মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে নিজ রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমরা কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তা থেকে উত্তম অথবা তার সমান কোন আয়াত এনে

নাযিল করেন। অন্য আয়াতে এ ব্যাপারটিকে ইয়াহূদীদের কুকর্মের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্ল করে বলে, 'রা'এনা'। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।" [সূরা আন-নিসা: ৪৬]

(১) এ শব্দটির অর্থ 'আমাদের প্রতি তাকান'। এ শব্দের মাঝে ইয়াহূদীদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ ধরণের শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, অমুসলিম তথা বাতিল পন্থীরা যে সমস্ত দ্ব্যর্থমূলক শব্দ এবং সন্দেহমূলক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

(২) আহলে-কিতাব শব্দদ্বয়ের অর্থ কিতাবওয়ালা বা গ্রন্থধারী। আল্লাহ্ তা'আলা আহলে-কিতাব বলে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন, যাদেরকে তিনি ইতঃপূর্বে তাঁর পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত সম্বলিত গ্রন্থ প্রদান করেছেন। ইয়াহূদী এবং নাসারারা সর্বসম্মতভাবে আহলে কিতাব। এর বাইরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন জাতিকে কিতাব দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

দেই[১]। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, নেই সাহায্যকারীও।

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল[২]? আর

(১) এই আয়াতে কুরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত হয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা, স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। আয়াতে 'নস্‌খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা - অর্থাৎ রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধান' টি কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তার সাথীরা কি চেয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সেটা অন্য আয়াতে বিস্তারিত এসেছে। বলা হয়েছে, "কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৩] অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, রাফে' ইবনে হারিমলাহ এবং ওয়াহাব ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্য একটি কিতাব আসমান থেকে নাযিল করে আন, যা আমরা পড়ে দেখব। আর আমাদের জন্য যমীন থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দাও। যদি তা কর তবে আমরা তোমার অনুসরণ করব ও তোমার সত্যয়ন করব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযথা প্রশ্ন করা উচিত নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঐ মুসলিম সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে হারাম নয় এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে সেটি হারাম করে দেয়া হয়।" [বুখারী: ৭২৮৯, মুসলিম: ২৩৫৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন "যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে কিছু না বলি ততক্ষণ

بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

যে ঈমানকে কুফরে পরিবর্তন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ হারাল।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর কোন নির্দেশ দেন[১]-- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পেশ করবে আল্লাহ্র কাছে তা পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا

১১১. আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো

তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছিল"। [বুখারী: ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

(১) তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ নাযিল করেন। অতঃপর ইয়াহূদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়। সূরা আত-তাওবাহ এর ৫ ও ২৯ নং আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতের এ ক্ষমার বিধান রহিত করা হয়। [তাবারী]

জান্নাতে প্রবেশ করবে না'[১]। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'।

أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয়[২] তার প্রতিদান তার

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। নাসারা ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ই দ্বীনের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন। জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত উপায় পরবর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

(২) আল্লাহ্‌র কাছে কোন বান্দার আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ এক. ইখলাস তথা বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। দুই. রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ। অর্থাৎ যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও 'ইবাদাত নিজের খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এ ক্ষেত্রেও আনুগত্য ও 'ইবাদাতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন। প্রথম বিষয়টি ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম। আল্লাহ্‌র ইখলাস ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান চার পর্যায়েঃ

ক) কারো কারো ইখলাস নেই, রাসূলের আনুগত্যও নেই, সে ব্যক্তি মুশরিক, কাফের।

খ) কারো কারো ইখলাস আছে, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য নেই, সে ব্যক্তি বিদ'আতকারী।

গ) কারো কারো ইখলাস নেই, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য আছে (প্রকাশ্যে), সে ব্যক্তি মুনাফেক।

يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

রব-এর কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানেনা তারাও একই কথা বলে(১)। কাজেই যে বিষয়ে তারা

ঘ) কারো কারো ইখলাসও আছে, রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণও আছে, সে ব্যক্তি হলো প্রকৃত মুমিন। [তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ]

(১) ইয়াহূদী হোক অথবা নাসারা কিংবা মুসলিম - যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। প্রত্যেক নবীর শরী'আতেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তাওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও ইঞ্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কুরআনের যুগে ঐসব কাজ-কর্মই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এবং তার মাধ্যমে আসা গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের হেদায়াতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইয়াহূদী ও নাসারাদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা দ্বীনের আসল প্রাণ ও বিশ্বাস, সৎকর্মকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইয়াহূদী আর কোন সম্প্রদায়কে নাসারা নামে অভিহিত করেছে।

কুরআনুল কারীমে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলিম, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলিমদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদেরকে

মতভেদ করতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র মসজিদগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি(১)।

মুসলিম বলি, সুতরাং জান্নাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই। এ ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলিমরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলিমের ঔরসে কিংবা মুসলিমদের আবাসভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম হয় না, বরং মুসলিম হওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

(১) ইসলাম-পূর্বকালে ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করলে নাসারারা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াহূদীদের উপর আক্রমণ চালায় - তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন করে দেয়। এতে ইয়াহূদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাসারাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ট শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী বায়তুল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা ও বিধানও প্রমাণিত হয়।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই; সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক(১)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী,

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে-নব্বীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। এক সালাতের সওয়াব মসজিদে হারামে একলক্ষ সালাতের সমান এবং মসজিদে নব্বীতে এক হাজার সালাতের সমান। আর বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে পাঁচশত সালাতের সমান। এই তিন মসজিদে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায় করা উত্তম মনে করে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে আসা জায়েয নেই।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও সালাতে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে সালাত আদায় ও তিলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের সালাত আদায় ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে সালাত আদায় করার জন্য কেউ আসে না কিংবা সালাত আদায়কারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

(১) وَجْهُ اللّٰه শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র চেহারা। মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্র চেহারা রয়েছে। তবে তা সৃষ্টির কারও চেহারার মত নহে। কিন্তু এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - সকল দিকই যেহেতু আল্লাহ্র সুতরাং মুসল্লী পূর্ব ও পশ্চিম যেদিকেই মুখ ফিরাক না কেন। সেদিকেই আল্লাহ্র কিব্লা রয়েছে। কেউ কেউ এ আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত মুখমণ্ডল বা চেহারা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। মূলতঃ এ আয়াতটিতে 'ওয়াজ্হ' শব্দটি দিক বা কেবলা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ্ এ আয়াতটিকে সিফাতের আয়াতের মধ্যে গণ্য করাকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন। [দেখুন - মাজমু' ফাতাওয়াঃ ২/৪২৯, ৩/১৯৩, ৬/১৫-১৬]

কোন কোন মুফাস্সির ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ আয়াতকে এই নফল সালাতেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের

সর্বজ্ঞ(১) ।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' । তিনি (তা থেকে) অতি পবিত্র(২) । বরং আসমান ও যমীনে যা

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন । পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল সালাতেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে । তবে সালাতরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে সে অবস্থায়ই সালাত পূর্ণ করবে । এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে সালাত আদায়কারীর জানা না থাকলে, রাতের অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে । [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে কেবলামুখী হওয়ার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল- মুকাদ্দাসের পূজা করা নয় । সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর কাছে অতি ছোট । এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে । আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমে বলা হয়েছে, তিনি وَاسِعٌ এ শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে । এক. প্রাচুর্যময়; অর্থাৎ তাঁর দান অপরিসীম । তিনি যাকে ইচ্ছা তার কর্মকাণ্ড দেখে বিনা হিসেবে দান করবেন । পূর্ব বা পশ্চিম তাঁর কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য নয় । তিনি দেখতে চাইছেন যে, কে তার কথা শুনে আর কে শুনে না । দুই. وَاسِعٌ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, সর্বব্যাপী । অর্থাৎ তিনি যেহেতু সবদিক ও সবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন সুতরাং তাঁর জন্য কোন কাজটি করা হল সেটা তিনি ভাল করেই জানেন । সে অনুসারে তিনি তাঁর বান্দাকে পুরস্কৃত করবেন । এ অর্থের সাথে পরে উল্লেখিত দ্বিতীয় গুণবাচক নাম عَلِيمٌ শব্দটি বেশী উপযুক্ত ।

(২) নাসারারা বলে থাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সন্তান গ্রহণ করেছেন । অথচ এটা সম্পূর্ণ একটি অপবাদ । কুরআনের অন্যত্র এসেছে, 'তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে । অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না' । [সূরা মার্ইয়ামঃ ৯১-৯৩] এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ বলেন, মানুষ আমার উপর মিথ্যারোপ করে, অথচ তাদের এটা উচিত নয় । মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ তাও তাদের জন্য উচিত নয় । মিথ্যারোপ করার অর্থ হলো, তারা বলে, আমি তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করে পূর্বের ন্যায় করতে সক্ষম নই । আর গালি

কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা[১] বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কেন আসে না কোন আয়াত?' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত কথা বলতো। তাদের অন্তর একই রকম[২]। অবশ্যই আমরা আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি, এমন কওমের জন্য, যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

দেয়ার অর্থ হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র।" [বুখারীঃ ৪৪৮২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "কষ্টদায়ক কথা শুনার পর আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন ও রিযিক দেন।" [বুখারী: ৭৩৭৮, মুসলিম: ২৮০৪]

(১) এদের সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। এক. এরা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবনে হারীমলাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক তবে আল্লাহ্‌কে বল আমাদের সাথে কথা বলতে যাতে করে আমরা তার কথা শুনতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। দুই. মুজাহিদ বলেন, এরা হচ্ছে, নাসারা সম্প্রদায়। তিন. কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, এরা হচ্ছে আরবের কাফের সম্প্রদায়। ইবনে কাসীর এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগের পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরণের সন্দেহ-সংশয়, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩

১১৯. নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে(১)। আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠

১২০. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত'। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ

১২১. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি(২),

(১) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণে ভূষিত করা হয়েছে। প্রথম. 'আল-মুরসাল বিল হক্ক' বা যথাযথভাবে প্রেরিত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার রাসূল প্রেরণের উপর সাক্ষী হচ্ছেন যে, তিনি তাকে যথাযথভাবে হক সহ প্রেরণ করেছেন। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'বাশীর' বা সুসংবাদ প্রদানকারী। তিনি নেককারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী। তৃতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'নাযীর' বা ভীতিপ্রদর্শনকারী। যারা তার অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এ ভীতিপ্রদ সংবাদ তিনি সবাইকে প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরূপ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [সূরা আল-ইসরা: ১০৫, আল-ফুরকান: ৫৬] আরও বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [সূরা সাবা: ২৮] আরও এসেছে, ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ﴾ [সূরা ফাতির: ২৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ﴾ [সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটি শুধু কুরআনে নয়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, বুখারী: ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৪]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে ইয়াহূদী ও নাসারাদের বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে[১], তারা তাতে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে ইস্‌রাঈল-বংশধররা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (তৎকালীন) সৃষ্টিকুলের সবার উপর।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর তোমরা সেদিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

---

(১) যথাযথভাবে তিলাওয়াতের অর্থ, তিলাওয়াতের হক আদায় করা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ যখন জান্নাতের বর্ণনা আসবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জান্নাত চাওয়া। আর জাহান্নামের বর্ণনা আসলে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি চাওয়া। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ, এগুলোর হালালকে হালাল হিসেবে নেয়া। আর হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা। যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পড়া। সেগুলোর কোন অংশকে বিকৃত না করা এবং সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীতে কোন বাজে ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা। মোটকথা: আল্লাহ্‌র আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই এর যথাযথ তেলাওয়াত বলে বিবেচিত হবে। [ইবনে কাসীর] যথাযথ তেলাওয়াতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, ইয়াহূদী ও নাসারাদের যে কেউ আমার কথা শোনার পর আমার উপর ঈমান আনবে না, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে"। [মুসলিম: ১১৫৩]

وَإِذِ ابْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ

১২৪. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন[১], অতঃপর তিনি সেগুলো

(১) যে যে বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمَات (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সাহাবী ও তাবে'য়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মুল্যবান পোষাক উপহার দেয়া। তাই তাকে বিভিন্ন রকমের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমনকি তার আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন দ্বীন তাকে দেয়া হয়। জাতিকে এ দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি নবীসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পরিবারবর্গ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন, 'হে আগুন! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।' [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৬৯]

এ পরীক্ষা শেষ হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র জন্মভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, স্ত্রী হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে সংগে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। [ইবনে কাসীর] জিবরীল 'আলাইহিস্ সালাম আসলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন শুস্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র বন্ধু তার রবের ভালবাসায় এ জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই তাদের

থাকতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ পেলেন যে, স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যান। আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি' - স্ত্রীকে একটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন?' ইবারাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, 'হ্যাঁ'। আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জানতে পেরে হাজেরা বললেন, 'যান, যে প্রভূ আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না'। [বুখারীঃ ৩৩৬৪]

অতঃপর হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। সাথের সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার উঠা-নামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষও দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটোছুটি করে তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হাজেরা যখন নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করলেন এবং শুস্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৩৬৫] বর্তমানে এ ধারার নামই যম্যম্। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব পত্রও সংগৃহীত হল।

ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেল। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র ইংগিতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়?' পিতৃভক্ত বালক বলল, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন"। [সূরা আস্-সাফ্ফাতঃ ১০২] এর পরবর্তী ঘটনা সবার জানা আছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো'(১)। তিনি বললেন,

পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এই রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিত্রাত' বা প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত, ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা আল-বারাআতে, দশটি সূরা আল-মুমিনূনে এবং দশটি সূরা আল-আহ্যাবে বর্ণিত হয়েছে।' [ইবনে কাসীর] ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু'আনহুমার উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলিমদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনে উল্লেখিত كلمات যেসব বিষয়ে খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে।

(১) এ আয়াত দ্বারা একদিকে বুঝা গেল যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে সাফল্যের প্রতিদানে মাবনসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় সূরা আল-বারাআত বা আত-তাওবার ১১২ নং আয়াত, সূরা আল-মুমিনূন এর ১-১১ এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুনান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "যখন তারা সবর করলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্চিত বিশ্বাসী হল, তখন আমরা তাদেরকে

'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' (আল্লাহ্) বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না[১]।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن

১২৫. আর স্মরণ করুন[২], যখন আমরা কা'বাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র[৩]

নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে"। [সূরা আস-সাজদাহ:২৪] এই আয়াতে বর্ণিত صَبر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা। আর يَقِين হলো কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা। কারও মধ্যে এগুলোর পূর্ণতার ভিত্তিতেই নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নবী ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তার সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। সন্তানদের জন্য এ দো'আর মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য-মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ দো'আটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরদের মধ্যে কখনো সত্যদ্বীনের অনুসারী ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনো ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন, যায়েদ ইবনে আমর, ওরাকা ইবন নওফাল এবং কেস ইবন সায়েদা প্রমূখ।

(২) এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক কা'বা গৃহের নির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর কিছু বর্ণনা আসছে।

(৩) مثابةً শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বার বার তার দিকে ফিরে যেতে আকাংখী হবে। মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, 'কোন মানুষ কা'বা গৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই

مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

ও নিরাপত্তাস্থল(১) করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর(২)। আর ইব্‌রাহীম ও

যিয়ারতের অধিক বাসনা নিয়ে ফিরে আসে'। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন আলেমের মতে, কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(১) أمناً শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। আর بيت শব্দের অর্থ ঘর। তবে এখানে শুধু কা'বাগৃহ উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মসজিদুল হারাম। কুরআনে بيت الله ও كعبة বলে সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ "তারপর তাদের যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে" [সূরা আল-হাজ্জ:৩৩] কারণ, এতে কুরবানী যবাই করার কথা আছে। কুরবানী কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমরা কা'বার হারাম শরীফকে শান্তির আলয় করেছি'। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(২) এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। [সহীহ্ আল-বুখারী] আনাস রাদিয়াল্লাহু'আনহু বলেন, আমি এই পাথরে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু'আনহুমা থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হারাম শরীফই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তাওয়াফের পর যে দু'রাকাআত সালাত মাকামে ইবরাহীমে আদায় করার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হারাম শরীফের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত।

ইস্‌মা'ঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য(১) আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে(২)।

আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তাওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন যে, কা'বা ছিল তার সম্মুখে এবং কা'বা ও তার মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। [দেখুন, সহীহ মুসলিম: ১২১৮] আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাআত সালাত ওয়াজিব।

(১) শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তাওয়াফ, ই'তেকাফ ও সালাত। দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফ আগে আর সালাত পরে। তৃতীয়তঃ ফরয হোক কিংবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন সালাত আদায় করা বৈধ।

(২) এখানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরে বসে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভূ, মা'বুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ নির্দেশে بيتى শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু'আনহু মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন - তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না? অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗۤ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে[১] তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন'। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মা'ঈল কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) 'হে আমাদের রব[২]! আমাদের পক্ষ

(১) আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দো'আ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দো'আয় যখন ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দো'আ কবুল হল, যালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দো'আটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দো'আ। খলীল 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দো'আর শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দো'আ শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের-মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা আখেরাতে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম رب শব্দ দ্বারা দো'আ আরম্ভ করেছেন। তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দো'আ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

থেকে কবুল করুন(১)। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ(২)।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. 'হে আমাদের রব! আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আর আমাদেরকে 'ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে

ইসমাঈল বললেন, আপনার রব আপনাকে যা নির্দেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম পাশের একটি উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে 'এখানে' একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর তারা দু'জনে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে তা উঁচু করছিলেন। ইসমাঈল পাথর নিয়ে আসতেন আর ইবরাহীম ঘর বানাতেন। তারপর যখন ঘর উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল এ পাথরটি এনে ইবরাহীমের পায়ের নীচে রাখলেন। তখন ইবরাহীম তাতে দাঁড়িয়ে ঘর বানাতে থাকলেন। এমতাবস্থায় তাদের মুখ থেকে এ দো'আ বের হচ্ছিল।" [বুখারী: ৩৬৬৪]

(১) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূ-খণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুস্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী ইবাদাতকারীর অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তার ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্র এমন একজন বন্ধু যিনি আল্লাহ্র প্রতাপ এবং মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র উপযুক্ত 'ইবাদাত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দো'আ করা প্রয়োজন যে, হে আমার রব! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসংগে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাই বলেছেন, ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ - হে রব! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছেন।

দিন[১] এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই বেশী তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

১২৯. 'হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান[২], যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন[৩]; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা

(১) আয়াতে বর্ণিত مَنَاسِك এর অর্থ ইবাদাতও হয়, যেমনটি উপরে করা হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, হজের নিয়মাবলী। [তাবারী]

(২) হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি, আমার পিতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদ এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হল, যে আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৬২] 'ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদের অর্থ তার এ উক্তি ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ "আমি এমন এক নবীর সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তার নাম আহমাদ"। [সূরা আস্-সাফঃ ৬] তার জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তার পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসংগে দু'জায়গায়, সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আয় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যে নবীর জন্য দো'আ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আর কারণে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার একান্ত কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব বলেন, 'আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না'। [মুফরাদাতুল কুরআন]

দেবেন(১) এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন(২)। আপনি তো পরাক্রমশালী,

(১) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণের বিশেষ করে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান। এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্র কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা - সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। ইমাম রাগেব বলেন, এ শব্দটি আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান ও সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হিকমতের অর্থ কি? মূলত: এখানে হিকমত শব্দের অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর রাহিমাহুল্লাহ্ কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হিকমত অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ দ্বীনের গভীর জ্ঞান, কেউ শরী'আতের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ।

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণ বিশেষ করে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ। আয়াতে উল্লেখিত يُزَكِّيهِمْ শব্দটি زكاة শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সকল প্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শির্ক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়াপ্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ্তে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হেদায়াত ও সংশোধনের ধারা দু'টি, আল্লাহ্র রাসূল ও আল্লাহ্র গ্রন্থ। এ দু'টি ব্যতীত কারও হেদায়াত লাভ হতে পারে না।

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম অনেকগুলো দো'আ করেছিলেন (১) "আপনার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। আপনি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন - যাতে এখানে বসবাস করা আতংকজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়"। আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন এবং সে ঊষর মরু প্রান্তর মক্কা নগরীতে পরিণত হয়েছে। (২) "হে রব! শহরটিকে শান্তির ভূমি করে দিন"। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখুন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই দো'আও কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররামা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চারদিক

প্রজ্ঞাময়' ।

থেকে মুসলিমগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা হারাম শরীফের চতুঃসীমানায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। (৩) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর তৃতীয় দো'আ এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা-মুকাররমা ও পাশ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম -নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমের দো'আ কবুল করেন। মক্কার কাছেই তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়। এখনো সারা বিশ্ব থেকে ফলমূল মক্কায় নিয়ে আসা হয়। (৪) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর চতুর্থ দো'আ হচ্ছে, "হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আমাদেরকে 'ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। এ দো'আটিও ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ও আল্লাহ্ভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দো'আ করেন যে, আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন। কারণ, আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে তত বেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এ দো'আতে স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, যিনি আল্লাহ্র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন, তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখেন। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা শারিরিকের চাইতে আত্মিক ও জাগতিকের চাইতে পরলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন বেশী। এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন - "আমার সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর"। (৫) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ভবিষ্যত বংশধরদের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মংগলের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করুন - যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দো'আয় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই নবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তার সন্তানদের জন্য গৌরব-এর বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে নবী হলে তার চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্‌রাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম[১]'।

(১) আল্লাহ্ তা'আলার أَسْلِمْ - 'আনুগত্য গ্রহণ কর' সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ - 'আমি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করলাম' বলা যেত। কিন্তু খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকুলের রবের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারও প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমনটা করাই ছিল আমার প্রতি অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন বা সৃষ্টিকুলের রব। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, মিল্লাতে ইবরাহিমীর মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত - যার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত নবীর অভিন্ন দ্বীন এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মিল্লাতে ইবরাহিমীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার দ্বীনের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দো'আ প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম) মুসলিম

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১৩২. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও

(অর্থাৎ আনুগত্যশীল) করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদলকে আনুগত্যকারী করুন'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার সন্তানদের প্রতি অসীয়ত প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ করো না'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পর তারই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলিম'। এ উম্মতের দ্বীনও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে"। [সূরা আল-হাজ্বঃ ৭৮] দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরব-এর মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী দ্বীনের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনই ইবরাহিমী দ্বীনের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত রাসূল আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরী'আত নাযিল হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হিদায়াতের অনুসরণ। পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলিম এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা দ্বীনের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরী'আতের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে - যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরী'আতের অনুসরণ করছে বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ। গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদ পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

না[১]' ।

(১) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মিল্লাত বা দ্বীন ইসলাম তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকূব 'আলাইহিমুস্ সালাম কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ এই যে, সন্তানদের ভালবাসা এবং মঙ্গলচিন্তা রিসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্র বন্ধু যিনি এক সময় তার পালনকর্তার ইংগিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য তার পালনকর্তার দরবারে দো'আও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ ইসলাম। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার দামী বস্তু। অথচ নবী-রাসূলগণের দৃষ্টি অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রপ্তানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায় তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। কিন্তু নবীগণ ও তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বলে মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। আর সেটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উপর অটুট থাকা ও এর একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া। এ জন্য তারা দো'আ করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসীয়ত করেন। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নবী-রাসূলগণের এ বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না। নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এরপর অন্যদিকে মনোযোগ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. ইয়া'কূবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার 'ইবাদাত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা

দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে - প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতা-মাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলেঃ "হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর"। [সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল তার হেদায়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন"। [সূরা আশ্-শু'আরাঃ ২১৪] আরও বলা হয়েছেঃ "পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও সালাত অব্যাহত রাখুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১৩২] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। তৃতীয়তঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারকার্যের জবাবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়শকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেলঃ "মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে"। [সূরা আন্-নসরঃ ২] আজকাল দ্বীনহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও দ্বীনী হলেও সন্তানদের দ্বীনী হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

আপনার ইলাহ্[১] ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহ্ - সেই এক ইলাহ্‌রই 'ইবাদাত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী'[২]।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তারা ছিল এমন এক জাতি, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না[৩]।

(১) ইলাহ্ শব্দটি মাসদার। যার অর্থ উপাস্য বা যার উপাসনা করা হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইলাহ্ হলেন যাকে সবাই উপাসনা করে। [তাফসীরে তাবারীঃ ১/৫৪] ইবনে আব্বাসের এই উক্তি শুধুমাত্র হক মা'বুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ ইলাহ্ শব্দ দ্বারা এমন মা'বুদকে বুঝানো হয়, যিনি 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। আর যিনি মা'বুদ হওয়ার যোগ্য তাঁর মধ্যে এমন গুণ থাকা আবশ্যক যার কারণে তাঁকে সর্বোচ্চ ভালবাসা এবং সবচেয়ে বেশী বিনয় প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নবীদের সবার দ্বীনই ছিল ইসলাম। এ জন্যই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবীগণ হচ্ছেন বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মাতা বিভিন্ন কিন্তু তাদের দ্বীন এক।" [বুখারীঃ ৩৪৪৩, মুসলিমঃ ২৩৬৫] মাতা বিভিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের শরী'আত বিভিন্ন। আর দ্বীন এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাওহীদের মূলনীতিসমূহে তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(৩) আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না - যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছেঃ "একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬৪, আল-ইস্‌রাঃ ১৫, ফাতিরঃ ১৮, আয্-যুমারঃ ৭, আন্-নাজমঃ ৩৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে বনী-হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন অন্যান্য লোকজন নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী বা নাসারা হও, সঠিক পথ পাবে'। বলুন, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করব(১) এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি(২) নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে(৩)।

আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না'। [মুসলিমঃ ২৫৪৩] অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না'। [মুসলিমঃ ২৬৯৯, আবু দাউদঃ ১৪৫৫]

(১) আয়াতের আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করব, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দুটো অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য। [তাফসীরে ফাতহুলকাদীর]

(২) কুরআন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরকে أَسْبَاط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বারজন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে মিশরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফির'আউনের সাথে মোকাবেলার পর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন মিশর থেকে ইসরাঈল-বংশধরকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের একটি গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, অনেক নবী ও রাসূল ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশেই জন্মেছে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পড়ত এবং মুসলিমদের জন্য আরবীতে অনুবাদ করে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না, মিথ্যারোপ

আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না[১]। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী'।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ

১৩৮. আল্লাহ্র রং এ রঞ্জিত হও[২]। আর

করবে না; বরং বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইস্মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে।" [বুখারী: ৪৪৮৫]

(১) নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না - আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। তার আসল দ্বীন হচ্ছে বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার দ্বীন নয়।

(২) আল্লাহ্র রং বলতে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের নিকট উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ্র দ্বীন বা ইসলাম। সারমর্ম হলো - যা কিছু বর্ণিত হলো, তা হলো আল্লাহ্র দ্বীন, তাঁর নবী ইবরাহীমের মিল্লাত, এটা হলো সর্বোত্তম রং। আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। (এক) আমরা আল্লাহ্র রং ধারণ করেছি। (দুই) আল্লাহ্র রং ধারণ কর। নাসারাদের দ্বীনের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হত। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ্ যেন ধুয়ে গেল এবং তার জীবন যেন রং ধারণ করল। পরবর্তী কালে নাসারাদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে

وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

রং এর দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ‘ইবাদাতকারী।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. বলুন, ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব! আমাদের জন্য আমাদের আমল। আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল(১); এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ(২)’।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

১৪০. তোমরা কি বল যে, ‘অবশ্যই ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?’ বলুন, ‘তোমরা কি বেশী জান, না

এর পরিভাষিক নাম হচ্ছে -‘ইস্‌তিবাগ’ বা রঙ্গিন করা (ব্যাপ্টিজম)। তাদের দ্বীনে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপ্টাইজড করা হয় না, বরং নাসারা শিশুদেরকেও ব্যাপ্টাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, এ লোকাচারমূলক রঞ্জিত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

(১) তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের ‘ইবাদাতকে বিভক্ত করে থাক এবং অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার ‘ইবাদাত ও আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদেরকে তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের যাবতীয় ‘ইবাদাত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা এ কথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

(২) এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা; মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

আল্লাহ্?' তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য আছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. তারা এমন এক উম্মাত, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২. মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হিদায়াত করেন'।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী(১) জাতিতে পরিণত করেছি,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

(১) وسطاً শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সা'য়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম عدل শব্দ দ্বারা وسط এর ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারীঃ ৭৩৪৯] এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবার وسط অর্থ হয় মধ্যবর্তী, মধ্যপন্থী। সে হিসাবে এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নবী ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, 'আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার

করে'। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮১] এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাধ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই। অন্য সূরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 'তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখবে। [সূরা আলে-ইমরান:১১০] অর্থাৎ মুসলিমরা যেমন সব নবীর শ্রেষ্ঠতম নবীপ্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহ্ ভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা ত্যাগের বদৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাংখা ও তাদেরকে জান্নাতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। এ সম্প্রদায়টি গণমানুষের হিতাকাংখা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলিম জাতি এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায়।

তাদের মধ্যে রয়েছে, ঈমানের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা নবীগণকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছেঃ 'ইয়াহূদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র'। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩০] অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে নবীর উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্বেও তাদের নবী যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন তারা পরিস্কার বলে দিয়েছে, 'আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব'। [সূরা আল-মায়েদাহ:২৪] আবার কোথাও নবীগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদেরই হাতে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই মনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা আল্লাহ্র দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার প্রশংসা এবং গুণগান করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতর থাকে।

তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে, কর্ম ও 'ইবাদাতের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরী'আতের বিধি-বিধানগুলোকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং 'ইবাদাত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও 'ইবাদাত বলে মনে করে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি যুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। মহিলাদের অধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী'আত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লংঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

তদ্রূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য। অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরাবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী'আত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরী'আত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও(১) এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন(২)। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে

ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল, ১. মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। ২. ইজমা শরী'আতের দলীল। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইজমা (মুসলিম আলেমদের ঐক্যমত) যে শরী'আতের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব।

(২) এ উম্মাত হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল নবীর উম্মতরা তাদের হিদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন নবীও আমাদের হেদায়াত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, নবীগণ সবযুগেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আনীত হিদায়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ডেকে বলবেন, হে নূহ! আপনি কি আমার বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি তিনি কিছু পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে নূহ! আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আর রাসূল তখন তোমাদের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেবেন। এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [বুখারীঃ ৪৪৮৭]

প্রকাশ করে দিতে পারি[১] কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের

(১) আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, لِنَعْلَمَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, 'যাতে আমরা জানতে পারি'। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে কেউ কেউ এটা মনে করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ বুঝি আগে জানতেন না, ঘটনা ঘটার পরে জানেন। মূলত: এ ধরনের বোঝার কোন অবকাশই ইসলামী শরী'আতে নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আগে থেকেই সবকিছু জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জানা বিষয়টি অনুসারে বান্দার কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দিয়ে বান্দার উপর তাঁর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে করে তার জানার উপর ন্যায় বরং বাস্তব ভিত্তিতে তিনি বান্দাকে সওয়াব বা শাস্তি দিতে পারেন। মূলত: এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত।" [সূরা আলে ইমরান: ১৫৪] এ আয়াতে 'পরীক্ষা' করার কথা বলার মাধ্যমে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় আয়াতের শেষে 'আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত' এ কথা বলার মাধ্যমে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র যেমন, সূরা আল-কাহাফ:১২, সাবা: ২১ এ ব্যবহৃত لِنَعْلَمَ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা দ্বীন ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোন কোন মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে সালাত। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব সালাত আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলিম ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, তারা

প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৪. অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি(১)। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন(২)। অতএব আপনি মসজিদুল

বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে গেছেন - কা'বার দিকে সালাত আদায় করার সুযোগ পাননি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৪৮৬] এতে সালাতকে ঈমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ১. তাদের সব সালাতই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ২. আমল ঈমানের অংগ। ৩. সালাত ঈমানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, সালাতকে বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(১) কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন ইসরাঈল-বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বায়তুল-মুকাদ্দাসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহিমী কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময় হয়ে গেছে। কা'বা মুসলিমদের কেবলা সাব্যস্ত হোক - এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক বাসনা। তিনি এর জন্য দো'আও করছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশ্‌তা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না।

(২) এ আয়াতাংশটি হচ্ছে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি তৃতীয় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে উম্মে বিশ্‌র ইবনে বারা' ইবনে মা'রুর-এর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় গিয়েছিল। তিনি সেখানে সালাতে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'রাকা'আত সালাত আদায় হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময় তৃতীয় রাকা'আতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তার সঙ্গে জামা'আতে শামিল সমস্ত লোক বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ১/২৪২] এরপর মদীনা ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হল। বারা ইবনে 'আযেব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা এমন অবস্থায় পৌঁছল, যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই সবাই সে অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালেক বলেন, এ খবরটি

হারামের দিকে(১) চেহারা ফিরান(২)। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও এবং নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটা তাদের রব-এর পক্ষ হতে হক। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ

১৪৫. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সমস্ত দলীল নিয়ে আসেন, তবু তারা আপনার

কুবায় পৌঁছল পরের দিন ফজরের সালাতের সময়। লোকেরা এক রাকা'আত সালাত শেষ করেছিল, এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলঃ 'সাবধান! কেবলা বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কেবলা নির্দিষ্ট হয়েছে।' এ কথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামা'আত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। [অনুরূপ বর্ণনা, বুখারীঃ ৪৪৮৬]

(১) 'মসজিদুল হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে এমন 'ইবাদতগৃহ, যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

(২) হিজরতের পূর্বে মক্কা-মুকার্‌রামায় যখন সালাত ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই সালাতের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মুকাদ্দাস ছিল - এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেনঃ ইসলামের শুরু থেকেই কিবলা ছিল বায়তুল-মুকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মুকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মুকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভব ছিল না। তাই তার মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেনঃ মক্কায় সালাত ফরয হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলিমদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম-এরও কেবলা তাই ছিল। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর তার কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ নাযিল হয়।

قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন(১)। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট সত্য-জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. সত্য আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا

১৪৮. আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়(২)। অতএব

---

(১) আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কা'বা কেয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইয়াহূদী-নাসারাদের সে মতবাদ খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলিমদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কেবলা ছিল কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস হল, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় কা'বা হল। আবারো হয়ত বায়তুল-মুকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে। [তাফসীরে বাহরে মুহীত]

(২) وجهة শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ কেবলা। এ ক্ষেত্রে উবাই ইবনে কা'ব وجهة এর স্থলে قبلة ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই 'ইবাদাতের সময় মুখ করার জন্য একটি নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে আপনার চেহারা ফিরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এর দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও(১), যাতে তাদের মধ্যে যালিম ছাড়া অন্যদের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর

নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ বাক্যটি তিনবার এবং ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈএর ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলিমদের জন্যও তাদের 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাজেই এ নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হত, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হত না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইংগিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

১৫১. যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি[১], যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর[২],

(১) এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইংগিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দো'আরও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তার কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছু নেই।

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত ﴿ فَٱذۡكُرُونِيٓ ﴾ এর সাথে। অর্থাৎ আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিক্‌রও আরেকটি নেয়ামত। সুতরাং এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(২) যিক্‌র আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে - (১) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়। (২) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা। (৩) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা। শর'য়ী পরিভাষায় যিক্‌র হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তাঁর নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তাঁর কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে,

তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তাঁর কাছে কিছু চেয়ে।

যিক্‌র দুই প্রকার। যথা - কওলী বা কথার মাধ্যমে যিক্‌র ও আমলী বা কাজের মাধ্যমে যিক্‌র। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে - কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের আলোচনা ও স্মরণ, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে - ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে কিছু যিক্‌র আছে যা সময়, অবস্থা এবং সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকাল ও সন্ধ্যার যিক্‌র, সালাতের পরের যিক্‌র, খাওয়ার শুরু-শেষ, কাপড় পরিধান, মসজিদে প্রবেশ-বাহির ইত্যাদি সহ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের দো'আ বা যিক্‌রসমূহ। যে সকল যিক্‌র অবস্থা, সময় ও সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর সংখ্যা, সময় অথবা অবস্থা কোনটিরই পরিবর্তন করা জায়েয নেই। যে সকল যিক্‌র এ তিনটির সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ সাধারণ যিক্‌র, সেগুলো সময়, সংখ্যা অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাও জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'মৌখিক যিক্‌রের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট শব্দ নির্ধারণ করা বিদ'আত'। [ইবনুল হুমাম, শরহে ফাত্‌হুল কাদীরঃ ২/৭২]

যিক্‌র এর ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করেন। আবু উসমান নাহ্‌দী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনুল কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্ 'যিক্‌রুল্লাহ্'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিক্‌রের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছেঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকরই করে না; প্রকাশ্যে যতবেশী সালাত এবং তাসবীহ্‌ই সে পাঠ করুক না কেন'। মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, যদি তার নফল সালাত ও সিয়াম কিছু কমও হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে সালাত-সিয়াম, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি যিক্‌র করে এবং যে ব্যক্তি যিক্‌র করেনা তাদের উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়'। [বুখারীঃ ২০৮] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম

আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর(১) ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন(২)।

আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ন ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ্'। [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি'। [বুখারীঃ ৭৪০৫] মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিক্রুল্লাহ্র সমান নয়'। যুন্নূন মিসরী বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন'।

(১) 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) 'ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]। 'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণা সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই 'সবর' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

(২) সালাত এবং 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। 'আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন' বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ্ আরশের উপর

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

১৫৪. আর আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত(১); কিন্তু তোমরা উপলব্ধি

থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দু'টি। প্রথম. সাধারন অর্থে 'সাথে থাকা'। যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত। তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার 'সাথে থাকা' বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(১) প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বা কবরে বিশেষ ধরণের এক প্রকার হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব ভোগ করে থাকে। তবে সে জীবনের হাকীকত আমরা জানি না। যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাদেরকে শহীদ বলা হয়। তাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনের অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তারপর তারা আরশের নীচে অবস্থিত কিছু ঝাড়বাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন তাদের রব তাদের প্রতি এক দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি চাও? তারা বলে হে রব! আমরা কি চাইতে পারি? আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তো আপনি আপনার কোন সৃষ্টিকে দেন নি? তারপরও তাদের রব আবার তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করেন। যখন তারা বুঝল যে, তারা কিছু চাইতেই হবে, তখন তারা বলে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ফেরৎ পাঠান, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হতে পারি। শহীদগণের সাওয়াবের আধিক্য দেখেই তারা এ কথা বলবে- তখন তাদের মহান রব তাদের বলবেন, আমি এটা পূর্বে নির্ধারিত করে নিয়েছি যে, এখান থেকে আর ফেরার কোন সুযোগ নেই।" [মুসলিম: ১৮৮৭] তবে সাধারণ নিয়মে শহীদদেরকে মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা

করতে পার না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব(১) কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে--

যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে ﴿لَا تَشْعُرُونَ﴾ (তোমরা বুঝতে পার না) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি। এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, শহীদেরা পার্থিব জীবনের মত জীবিত নন। তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ এক জীবন বরযখে দিয়েছেন, যার হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(১) কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পরে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবর-এর পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। মূলতঃ মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহ্র কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, "হে আল্লাহ্! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই"। [তিরমিযী: ২২৫৪]

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী(১)'।

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۭ وَمَنْ

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের(২) অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা)

(১) সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে - 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দো'আটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তা পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। দো'আটির অর্থ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহ্রই। আর আমরা তার দিকেই প্রর্তাবর্তন করব।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কোন কষ্ট দেন তবে তাতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটাই হচ্ছে, সবর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের কর্মকাণ্ড আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই ভাল। মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন খুশীর বিষয় সংঘটিত হয় তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায় তবে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কলাণকর হয়।" [মুসলিম: ২৯৯৯] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ বিপদ-মুসিবতে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলবে, এবং বলবে, হে আল্লাহ্ আমাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন" অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন" [মুসলিম: ৯১৮]

(২) ﴿شَعَآئِرِ اللّٰهِ﴾ এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। ﴿شَعَآئِرَ اللّٰهِ﴾ বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ঘরের হজ(১) বা 'উমরা(২) সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই(৩)। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. নিশ্চয় যারা(৪) গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ

(১) حج এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা পোষণ করা, সংকল্প করা। কুরআন-সুন্নাহ্র পরিভাষায় বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্ব বলা হয়ে থাকে।

(২) عمرة শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরী'আতের পরিভাষায়, ইহরামসহ আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তাওয়াফ-সা'য়ী প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি 'ইবাদাত সম্পাদনের নামই উমরাহ্।

(৩) 'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ কিংবা উমরার সময় কা'বা ঘরের তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরী'আতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সা'য়ী'। জাহেলী যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এ জন্য মুসলিমদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধহয় এ সা'য়ী জাহেলী যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়ত গোনাহ্র কাজ। কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলী যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তারা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে এ আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরও একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও সাফা-মারওয়ার মাঝখানের সা'য়ী প্রমাণিত। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪২১, ৪২২]

(৪) যারা আল্লাহ্র কিতাবের জ্ঞান গোপন করত, তারা ছিল ইয়াহূদী আলেম সম্প্রদায়। তারা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনকে একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণকে এ জ্ঞান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ গোষ্ঠীর লোকগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য ভ্রষ্টতা ও শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়তে নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করত। এ আয়াতে এ ধরণের প্রবণতা থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর(১), তাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও(২) তাদেরকে লা'নত

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হিদায়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়ঃ এক. যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন'। [আবু দাউদঃ ৩৬৫৮, ইবনে মাজাহ্ঃ ২৬৬, আহমাদঃ ২/২৬৩] দুই. 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহ্তে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে ﴿مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى﴾ বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও, যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেত্না-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমা] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে 'ইলমের শুধু ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। [বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ ৪৯ নং অধ্যায়]

(২) যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও যালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা

করেন[১]।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তাগণ ও সকল মানুষের লা'নত।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

জায়েয। এতে এ কথাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলিম কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদূদ', 'আল্লাহ্র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে কুরআনুল কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। মুফাসসিরগণ বলেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। [সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর: ২/৬৩৮, ৬৩৯, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫/২৪] কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই(১) ।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

১৬৪. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে(২), রাত ও দিনের পরিবর্তনে(৩),

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্র 'ইসমে আ'যাম' এ দু'টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে" । তারপর তিনি এ আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন । [তিরমিযী: ৩৪৭৮, আবু দাউদ: ১৪৯৬, ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৫]

(২) আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি । অন্যত্র তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যেমন "তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই ? আর আমরা বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্, আল্লাহ্র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ ।" [সূরা কাফ: ৬-৮] আর আসমান সম্পর্কে বলেছেন "যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান । রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না ; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন , কোন ত্রুটি দেখতে পান কি ? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে । আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ।" [সূরা আল-মুলক: ৩-৫] তারপর যমীন সম্পর্কে বলেছেন, "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে ।" [সূরা আল-মুলক: ১৫]

(৩) রাত দিনের পরিবর্তন কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় নি । অন্য আয়াতে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে । যেমন, "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?' বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ?" [সূরা আল-কাসাস: ৭১,৭২]

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

মানুষের উপকারী(১) দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান কওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে(২) ।

(১) এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যের আওতায় ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হত, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলো পচন অথবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল"। [সূরা আল-মুমিনূন: ১৮] কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র জমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যেকোন জায়গায় খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এ পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ববাদ সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তারই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ভালবাসার মতই[১]; পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে[২]। আর যারা যুলুম করেছে যদি তারা আযাব দেখতে পেত[৩], (তবে তারা নিশ্চিত

ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। অনুরূপভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালাকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হত না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হত না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" [সূরা আশ-শুরা: ৩৩]

(১) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে যেমন ভালবাসে তাদের মা'বুদদেরও তেমন ভালবাসে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা কাফেরদের মনেও ছিল, কিন্তু তা ছিল শির্কযুক্ত। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নয়।

(২) আয়াতের এ অংশের অর্থ, কাফেরগণ তাদের মা'বুদদের যতবেশীই ভালবাসুক না কেন, ঈমানদারগণ আল্লাহ্কে তাদের থেকে অনেক বেশী ভালবাসে। কেননা, ঈমানদারগণ তাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট করেছে। অপরপক্ষে, কাফেরগণ তাদের ভালবাসা তাদের মা'বুদদের মধ্যে বন্টন করেছে।

(৩) মুফাস্সিরগণ আয়াতের এ অংশের বিভিন্ন অর্থ করেছেনঃ

১) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে তারা যদি আখেরাতের শাস্তি দেখতে পেত এবং এও দেখতে পেত যে, যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র, এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা আর তাদের মা'বুদদের কোন শক্তিই নেই, তাহলে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 'ইবাদাত করছে, কখনোই তাদের

হত যে,) সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে,

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে'(১)।

'ইবাদাত করতো না।

২) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করেছে তারা যদি আল্লাহ্‌র শক্তি ও কঠোর আযাব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা তাদের মা'বুদদের 'ইবাদাত করার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত।

৩) সঠিক 'কেরাআত'-এর মধ্যে কেউ কেউ يرى শব্দটিকে ترى পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি - যারা শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে - এ লোকদেরকে শাস্তি থেকে ভীত অবস্থায় দেখতে পেতেন, তাহলে আপনি জানতেন যে, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। অথবা, এর অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি যালিমদেরকে শাস্তি প্রত্যক্ষরত অবস্থায় দেখতেন কেননা, যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্‌রই। তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে, তাদের শাস্তির পরিমাণ কত ভয়াবহ!

৪) সঠিক 'কেরাআত'-এর মধ্যে কেউ কেউ يَرَوْنَ শব্দটিকে يُرَوْنَ পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, যারা যুলুম করেছে, যখন তাদেরকে শাস্তি দেখানো হবে তখন তারা দেখতে পাবে যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১) এ আয়াতে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে নেতারা ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ হবে সেটার কিছু কথোপকথন ও তাদের অনুতাপের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি আরও বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনে কখনো বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নয়।' হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন

এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ(১)। আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا

১৬৮. হে মানুষ! তোমরা খাও যমীনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র(২) খাদ্যবস্তু রয়েছে

তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি।' আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা সাবা: ৩১-৩৩]

(১) আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদের খারাপ আমলসমূহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপের কারণ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাতে তাদের ঘর এবং জাহান্নামে তাদের ঘরের দিকে তাকাবে। সেদিন হচ্ছে আফসোসের দিন। তিনি বলেন, জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাবে তারপর তাদেরকে বলা হবে, হায় যদি তোমরা এর জন্য আমল করতে! তখন তাদেরকে আফসোস পেয়ে বসবে। আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাদের ঘরের দিকে তাকাবে, তখন তাদের বলা হবে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর তার দয়া না করতেন তবে তো তোমরা সেখানকার অধিবাসীই হতে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৪৯৬-৪৯৭]

(২) حلّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে। সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাংক[১] অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. সে তো শুধু তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়[২] মন্দ ও অশ্লীল[৩] কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না[৪]।

(১) خُطُوَاتٌ শব্দটি خُطْوَةٌ এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সে অনুসারে ﴿خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ﴾ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী পদক্ষেপসমূহ বা শয়তানী কর্মকাণ্ড। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, "আমি আমার বান্দাকে যে সম্পদ দিয়েছি তা বৈধ। আর আমি আমার সকল বান্দাকেই একনিষ্ঠ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর তা হারাম করে দেয় যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম।" [মুসলিম: ২৮৫৬] (অর্থাৎ তারা সেগুলোকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে হারাম বানিয়ে ফেলে)

(২) এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তানের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশ্তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৫৪৩] শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশ্তাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়। [দেখুন, সহীহ ইবন হিব্বান: ৯৯৭]

(৩) سُوْءٌ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاءٌ অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْءٌ এবং فَحْشَاءٌ - এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ সাধারণ গোনাহ্ এবং কবীরা গোনাহ্।

(৪) না জেনে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা বড় গোনাহ। এ আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলাকে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আল-আ'রাফ: ২৮, ৩৩, সূরা ইউনুস: ৬৮] তবে এ আয়াতে 'না জেনে' কোন কথা বলতে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা অনুসরণ করবো তার, যার উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল

শয়তান মানুষকে নির্দেশ দেয় সেটা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র সেটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জন্তু-জানোয়ারকে ছেড়ে দেয়া, হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করা, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্র জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা থেকে তিনি পবিত্র। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১০৩] "তারা জিনকে আল্লাহ্র শরীক করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র---মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।" [সূরা আল-আন'আম: ১০০] "যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" [সূরা আল-আন'আম: ১৪০] "বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ?' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ" [সূরা ইউনুস: ৫৯] "তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না ?" [সূরা ইউনুস:৬৮] "তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং ওটা হারাম'। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না"[সূরা আন-নাহল: ১১৬] "আর তারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

না, তবুও কি?(১)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত যে, এমন কিছুকে ডাকছে যে হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা বুঝে না(২)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে

(১) এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে ﴿لَا يَعْقِلُوْنَ﴾ এবং ﴿وَلَا يَهْتَدُوْنَ﴾ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত। হিদায়াত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিস্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরী'আতের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়। অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্র এবং তাঁর হুকুম-আহ্কাম মানার জন্যই হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন, পরিমার্জিত]

(২) এ উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। (এক) তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মত, যারা এক-একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পিছনে চলতে থাকে এবং না জেনে-বুঝেই তাদের হাঁক-ডাকের উপর চলতে-ফিরতে থাকে। (দুই) এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, কাফের-মুশরিকদেরকে আহ্বান করার ও তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে, তা কিছুই বুঝতে পারে না। [মুয়াসসার]

খাও[১] এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত কর।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا

১৭৩. তিনি আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু[২],

(১) আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে- ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক আমল করুন"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দো'আ কবূল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবূল না হওয়ার আশংকাই থাকে বেশী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তিনি মুমিনগণকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন যেটার নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র থেকে খাও এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবগত। [সূরা আল-মুমিনূন: ৫১] আরও বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু খাও" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭২] তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করেছে, ধুলি-মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে খেয়েছেও হারাম। সুতরাং তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?" [মুসলিম: ১০১৫]

(২) অর্থাৎ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম হবে। তবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হল'। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৬] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ্ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল - মাছ এবং টিড্ডি (এক জাতীয় ফড়িং)'। [বাগভীঃ শরহুস্-সুন্নাহ্ঃ ২৮০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ্ঃ ৩২১৮] সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে

মাছ এবং ফড়িং মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ্ না করেও খাওয়া যাবে। অনুরূপ যেসব জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। আজকাল একরকম চোখা গুলী ব্যবহার হয়, এ ধরণের গুলী সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরদিকে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে গায়ে বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলী দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ার যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না। এক্ষেত্রে গুলী দ্বারা শিকার করা হলে তা আবার যবেহ্ করতে হবে।

এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সেই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যেকোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়।

তাছাড়া আয়াতে 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ﴿عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোর ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে, ﴿وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ﴾ [সূরা আন-নাহল:৮০] এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ্ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। [মা'আরিফুল কুরআন]

رক্ত[১], শূকরের গোশ্ত[২] এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে[৩], কিন্তু যে নিরূপায়

أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(১) আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ্ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা এবং এরূপ জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল। আর যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম।

(২) আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশ্ত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্ম' বা গোশ্ত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশ্ত হারাম এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশ্ত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। তবে লাহ্ম তথা গোশ্ত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ্ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্ত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ্ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ্ করার পরও শূকরের গোশ্ত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা অপবিত্র বস্তু। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ বা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ্ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ্ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত হয়। এমতাবস্থায় যবেহ্কৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহ্বিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾ আয়াতে যে অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্ করার সময় তা আল্লাহ্র নাম নিয়েই যবেহ্ করা হয়। যেমন অনেক

অথচ নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না(১)।

অজ্ঞ মুসলিম পীর, কবরবাসী বা জীনের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ্ করে থাকে। কিন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহ্কৃত জন্তু মৃতের শামিল। দুররে মুখতার কিতাবুয্-যাবায়েহ্ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 'যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তারই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ্ করা হয়' - এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। আল্লামা শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না , যবেহ্ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছেঃ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা' ও 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি"। [সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৩] তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরী'আতের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল ও বৈধ বলেনি; বলেছে, "তাতে তার কোন পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনো যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনোন্যপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে অনোন্যপায় হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়েদাহ:৩] অর্থাৎ ক্ষুধার কারণেই শুধু হারাম বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া[১] আর কিছুই খায় না। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; সুতরাং আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. সেটা এ জন্যই যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই তারা সুদূর বিবাদে লিপ্ত।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে[২] তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু

(১) এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই।

(২) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, ইয়াহূদীরা ইবাদতের সময় পশ্চিম দিকে আর নাসারারা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় বলেন, সালাতে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরী'আতের অন্য কোন হুকুম-আহ্কামই যেন আর নেই।

وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ

সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান(১) আনবে। আর সম্পদ দান করবে তার(২) ভালবাসায়(৩) আত্মীয়-

(১) অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলিম, ইয়াহূদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভেতরই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি সালাতে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্র ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। দুই. সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্ত্বেও সে উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাফসীরে বাগভী] এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসে সম্পদের আসক্তি সত্ত্বেও তা ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা থাকা সত্ত্বেও সাদাকাহ করা"। [বুখারী: ১৪১৯, মুসলিম: ১০৩২]

(৩) এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বীনীশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরয হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

স্বজন(১), ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে(২), অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে(৩)। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের(৪) বিধান

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয় স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে"। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৪/৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকাহ করা হয় তবে তা হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদকাহ। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮]

(২) অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহ্গাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তেমনিভাবে মু'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

(৩) আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, 'সবর'-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

(৪) 'কিসাস'-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে, 'অত:পর যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে'। অনুরূপ সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে, 'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে', এতে আলোচ্য বিষয়ই আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে মতে শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা বিশেষভাবে জরূরী: এক. কিসাস কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় সুতরাং 'কিসাস' অর্থাৎ 'জানের বদলে জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুই. এ ধরনের হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আয়াতে স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তিন. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, - যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে এবং অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। শরী'আতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট। চার. কেসাসের আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। পাঁচ. নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে 'কিসাস' ও 'দিয়াত'-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাসের দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। ছয়. 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক

الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের(১) পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির(২) অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালংঘন করে(৩) তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯. আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ-সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এখানে যে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কিসাস না গ্রহণ করে দিয়াত গ্রহণ করা। [বুখারী: ৪৪৯৮]

(২) এখানে কুরআনে 'মা'রূফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে উঠেঃ হ্যাঁ, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় 'উরফ' ও 'মা'রূফ' বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরী'আত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি, এমনসব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

(৩) ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করতে উদ্যত হয়। [বুখারী: ১১১, মুসলিম: ১৩৭০]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল। এটা মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য(১)।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. এটা শুনার পরও যদি কেউ তাতে পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা পাপের আশংকা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন অপরাধ

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর মতে অসিয়াত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি 'মীরাস'-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য অসিয়াত করা রহিত করে দেয়া হয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। অসিয়াত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কুরআনের মীরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজের বিখ্যাত খোত্‌বায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই'। [তিরমিযী: ২১২০, আবু দাউদ: ৩৫৬৫, ইবনে মাজাহ্: ২৭১৩]। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়াত করা জায়েয।

নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের(১) বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল(২), যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার(৩)।

(১) صوم এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়্যতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে সিয়াম হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি সিয়ামের নিয়্যত না থাকে, তবে তাও সিয়াম পালন হবে না। সিয়াম ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। সিয়ামের অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

(২) মুসলিমদের প্রতি সিয়াম ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিয়াম শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলিমদের এ মর্মে একটি সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, সিয়াম একটা কষ্টকর 'ইবাদাত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা কষ্টকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "সিয়াম যেমন মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; এ কথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের সিয়াম সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলিমদের উপর ফরযকৃত সিয়ামেরই অনুরূপ ছিল। যেমন, সিয়ামের সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের সিয়ামের সাথে মুসলিমদের সিয়ামের পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে সিয়ামের সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া'র ভিত্তি।

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে(১) বা সফরে থাকলে(২) অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে(৩)। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা(৪)। যদি

(১) বাক্যে উল্লেখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বুঝায়, সাওম রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

(২) সফররত অবস্থায় সাওম না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সাহাবাগণ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ সাওম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না।' [বুখারী: ১৯৪৭; মুসলিম: ১১১৬]

(৩) রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় বা সফরে যে কয়টি সাওম রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে বা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে কয়টি সাওম ছাড়তে হয়েছে, সে কয়টি সাওম অন্য সময়ে পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ফরয।

(৪) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং সাওম রাখার পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সাওম রাখতে চায় না, তাদের জন্যও সাওম না রেখে সাওমের বদলায় 'ফিদ্ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, 'সাওম রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর'। উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে সাওমে অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর নাযিলকৃত আয়াত ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে সাওম রাখতে অপরাগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দূর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। সাহাবী সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- বলেন, যখন ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে সাওম রাখতে পারে এবং যে সাওম রাখতে চায় না, সে 'ফিদ্ইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ নাযিল হল, তখন ফিদ্ইয়া দেয়ার

কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১৮৫. রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে(১)। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে(২)। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান

ইখ্‌তিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র সাওম রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল। [বুখারীঃ ৪৫০৭, মুসলিমঃ ১১৪৫, আবু দাউদঃ২৩১৫, ২৩১৬ ও তিরমিযীঃ ৭৯৮]

(১) এই একটি মাত্র বাক্যে সাওম সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহ্‌কাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشّهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমাদান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাদান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান থাকবে, তার উপর রমাদান মাসের সাওম রাখা কর্তব্য"। ইতঃপূর্বে সাওমের পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে সাওম রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। রমাদান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমাদান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া, যাতে সাওম রাখার সামর্থ্য থাকে।

(২) আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন সাওম না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের সাওম কাযা করে নেবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু সাওমের পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরোল্লেখ করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে(১)।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রামাদানের হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে সাওম ও ই'তিকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান রব-এর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ, সাওম সংক্রান্ত 'ইবাদাতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয়ে দো'আ করে, আমি তাদের সে দো'আ কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই। এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসীর দো'আর প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা সাওম রাখার পর দো'আ কবূল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই সাওমের ইফতারের পর দো'আর ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সিয়াম পালনকারীর দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অর্থাৎ কবূল হয়ে থাকে'। [ইবনে মাজাহ্: ১৭৫৩] সে জন্যই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ইফতারের সময় পরিবার পরিজনকে ডাকতেন এবং দো'আ করতেন। [ইবনে কাসীর]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ
نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে(১)। তারা তোমাদের পোষাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা

(১) যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে হারাম ছিল। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমাদানের সাওম ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেত। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়েস ইবনে সিরমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোথাও থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন তখন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই সাওম পালন করেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। [বুখারী: ১৯১৫] অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদিক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাতে সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়(১)। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত(২) অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না(৩)।

(১) আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে সাওমের শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়-সীমার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সে জন্য ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ﴾ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদিক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদিকের আলো ফোটার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং সাওমের মধ্যে সুবহে-সাদিকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং সাওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে-সাদিক উদয় হওয়া সম্পর্কে ইয়াকীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্‌রীর শেষ সময়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। জামা'আত হয় এমন যে কোন মসজিদেই ই'তেকাফ হতে পারে। ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণত সাওম পালনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়।

(৩) অর্থাৎ সাওমের মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেও না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে সাওম অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভেতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা, এসব ব্যাপার অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের পরিপন্থী। তাই সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌঁছে

এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে।

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না(১)।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ

১৮৯. লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে(২)। বলুন, 'এটা

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়। এ ব্যাপারে সাবধান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আল্লাহ্‌র সে সংরক্ষিত এলাকা হল, তাঁর নির্ধারিত হারাম বিষয়সমূহ। যে ব্যক্তি এর চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সে উক্ত সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে'। [মুসলিমঃ ২৬৮১]

(১) এ আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ, তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক-সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পার বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। কেননা, আদালত থেকে ঐ সম্পদের মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কাছে তো তা তোমার জন্য হারামই থাকবে।

(২) সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা আল-বাকারায়, একটি সূরা আল-মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আল-আ'রাফে দু'টি এবং সূরা আল-ইসরা, সূরা আল-কাহাফ, সূরা ত্বা-হা ও সূরা আন্-নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল - যার উত্তর কুরআনুল কারীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সূরা আল-আহযাব ও সূরা আয-যারিয়াতে একটি করে দু'টি প্রশ্ন ছিল।

لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক'। আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই[১]; বরং পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে[২] তোমরাও আল্লাহ্র পথে

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, "মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; দ্বীনের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্বেও তারা মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছিলেন"। [সুনান দারমী:১২৫]

(১) এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরী'আত প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরী'আতে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরী'আতসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্বেও না জায়েয মনে করত এবং পাপ বলে গণ্য করত, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরী'আতে যার কোন আবশ্যকতা ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। মূলত: 'বিদ'আত'-এর নাজায়েয হওয়ার বড় কারণই এই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে নাজায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরী'আত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে নাজায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদ'আত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) মুসলিমগণ শুধুমাত্র সেসব কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদ্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক

يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর[১]; কিন্তু সীমালংঘন করো না[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

১৯১. আর তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে[৩] এবং যে স্থান থেকে তারা

হয় না - সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে শুধুমাত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এ জন্য ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা ﴿الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' - এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হত, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

(১) আলেমগণ বলেন, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে নাযিলকৃত কুরআনুল কারীমের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

(২) বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ সে উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়্যত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে উমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়ত তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকল।

(৩) কেউ কেউ আল্লাহ্র বাণীঃ "তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে"-এ বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে জংগীবাদের প্রেরণাদায়ক বলে অপবাদ দেয়, তারা মূলতঃ এ আয়াতের অর্থই বোঝেনি। কারণ, এই আয়াতে "তাদেরকে" বলে ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে এসেছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের হত্যা করার জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করবে। আর ফেত্না হত্যার চেয়েও গুরুতর(১)। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না(২) যে পর্যন্ত না তারা

দু'টি - (১) তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধকারী সম্প্রদায় হবে। (২) তোমরা যদি এসব যুদ্ধবাজ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর, তবুও তোমরা যেহেতু মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ সেহেতু হত্যা করতে সীমালংঘন করোনা। যুদ্ধরত কাফেরদের ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কাফেরদের হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করোনা। যেমন, শিশু, অসুস্থ আঘাতপ্রাপ্ত, নারী এজাতীয়দের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আরও কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, (৩) যদি যুদ্ধবাজ কাফেররা যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয় তবে তোমরা তৎক্ষণাত যুদ্ধ ত্যাগ কর। (৪) তোমাদের উপর যতটুকু আক্রমণ হবে তোমরা ততটুকুই শুধু আক্রমণ করবে। (৫) তোমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ ক) ফিতনা তথা যাবতীয় বিপর্যয়, শান্তিভংগ, ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কার, যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, শির্ক, অসৎপথ ইত্যাদি থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। খ) তোমাদের 'ইবাদাত তথা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলতে যেন তারা বাধা না হয়। গ) তারা যেন তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে পারে। ঘ) তোমরা যে হক বা সত্যের অনুসারী, তার প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করা। এ পথের বাধা দূর করা।

(১) অর্থাৎ এ কথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকা এবং মুসলিমদেরকে উমরাহ্ ও হজের মত 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হল। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فتنة (ফেত্নাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শির্ক এবং মুসলিমদের 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও তাফসীরে কুরতুবী]

(২) পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরী'আতসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে এই বলে সীমিত করা হয়েছে, "মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হারামে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়"। সাধারণতঃ মক্কার সম্মানিত এলাকা তথা হারাম এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তার প্রতিরোধকল্পে

সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের পরিণাম।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯২. অতএব, যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেত্না[১] চূড়ান্ত ভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা[২] ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে[৩]।

যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফেকাহ্বিদগণ একমত। এ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, প্রথম অভিযান, আক্রমণ বা আগ্রাসন শুধুমাত্র মসজিদুল-হারামের পাশ্ববর্তী এলাকা বা মক্কার হারামেই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

(১) অর্থাৎ যখন 'দ্বীন' আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ফেত্নাকে নির্মূল করে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 'ফিতনা' এর তাফসীর করেছেন 'শির্ক'। [তাবারী]

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, যালিম তারাই, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে ও মানতে অস্বীকার করবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) সাহাবীগণের মনে সন্দেহ এই ছিল যে, আশহুরে-হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধ শুরু করে তবে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হারাম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরী'আতসিদ্ধ, তেমনি হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর[১] এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না[২]। আর

(১) এই আয়াত থেকে ফোকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলিমদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমনকিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ১.আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হল। [আবু দাউদ: ২৫১২, তিরমিযী: ২৯৭২] এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যই আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ২.বারা' ইবনে 'আযেব ও নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত

তোমরা ইহ্সান কর(১), নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহ্সীনদের ভালবাসেন।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

১৯৬. আর তোমরা হজ ও 'উমরা পূর্ণ কর(২) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ(৩) প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না(৪),

ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৬/৩১৭] এ জন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম। ইমাম জাস্সাস রাহিমাহুল্লাহ্-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত দু'টি অর্থই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) এ বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহ্সান' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ইহ্সান দু'রকমঃ (১) 'ইবাদাতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজকর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্সান। 'ইবাদাতের ইহ্সান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাদীসে জিবরাঈল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে 'ইবাদাত কর, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। [মুসলিমঃ ৮] এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু'আনহু বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা পছন্দ করো। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৭]

(২) হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের ফরযসমূহ বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(৩) হাদঈ বলতে এমন জানোয়ার বুঝায় যা মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্য থেকে যারা হজ ও উমরা একই সফরে আদায় করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র জন্য যবেহ্ করা ওয়াজিব হয়। যার রক্ত হারাম এলাকায় পড়তে হয়। মনে রাখাতে হবে যে, তা সাধারণ কুরবানী নয়।

(৪) আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ্রাম অবস্থায় চুল ছাঁটা বা কাটা অথবা মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।

أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে(১)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায়(২) সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য,

(১) যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদ্ইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে সাওম পালন করা বা সদকা দেয়া বা যবেহ্ করা। ফিদইয়া যবেহ্ করার জন্য হারামের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সাওম পালন বা সদকা দেয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে সাওমের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী কা'ব ইবনে উজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেনঃ 'তিন দিন সাওম অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার দাও, প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' খাবার দাও এবং তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল'। [বুখারীঃ ৪৫১৭]

(২) হজের মাসে হজের সাথে 'উমরাকে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও উমরাহ্র জন্য একত্রে এহ্রাম করা। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-কেরান' বলা হয়। এর এহ্রাম হজের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হবে, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু উমরার এহ্রাম করবে। মক্কায় আগমনের পর উমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে স্ব স্ব স্থান থেকে এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-তামাত্তু' বলা হয়।

যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর(১)।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

১৯৭. হজ্ব হয় সুবিদিত মাসগুলোতে(২)। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে সে হজ্বের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ(৩), অন্যায় আচরণ(৪) ও

(১) আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও উমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও উমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিওবা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকে ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নাত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

(২) যারা হজ্ব অথবা উমরা করার নিয়্যতে এহ্‌রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে উমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি উমরার মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিল্‌ক্বদ ও জিল্‌হজ্ব। হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা জায়েয নয়।

(৩) رفث 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহ্‌রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ এমনভাবে হজ্জ করবে যে, তাতে 'রাফাস, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' তথা অশ্লীলতা, পাপ ও ঝগড়া ছিল না, সে তার হজ্জ থেকে সে দিনের ন্যায় ফিরে আসল যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।" [বুখারী: ১৫২১, মুসলিম: ১৩৫০]

(৪) فسوق 'ফুসুক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা

التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

কলহ-বিবাদ(১) করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ্ তা জানেন(২) আর তোমরা

নাফরমানী করাকে 'ফুসুক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই ফুসুক বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু 'ফুসুক' শব্দের অর্থ করেছেন - সে সকল কাজ-কর্ম যা এহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ এহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সবসময়ই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের জন্য নিষেধ ও নাজায়েয, তা হচ্ছে ছয়টিঃ (১) স্ত্রী সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীব-জন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই এহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পোষাকের মত করে পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। আলোচ্য ছয়টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস যদিও 'ফুসুক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্রাম অবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্ফারা দিয়েও পরের বছর পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজন্যেই ﴿وَلَا رَفَثَ﴾ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) جدال শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এ জন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جدال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কেউ কেউ এস্থলে 'ফুসুক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসুক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্রামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদাতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, এহ্রামের পোষাক তাদেরকে সবসময় এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন 'ইবাদাতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) ইহ্রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হিদায়াত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময় ও স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকেই বিরত থাকা যথেষ্ট

পাথেয় সংগ্রহ কর[১]। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর[২]।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

১৯৮. তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই[৩]। সুতরাং যখন তোমরা 'আরাফাত[৪] হতে ফিরে

নয়, বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও 'ইবাদাত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম প্রতিদানও দেয়া হবে।

(১) এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও উমরাহ্ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাব পত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ আমার শাস্তি, আমার পাকড়াও, আমার লাঞ্ছনা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে চলে না, আমার নিষেধ থেকে দূরে থাকে না তাদের উপর আমার আযাব অবধারিত।

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, জাহেলিয়াতের যুগে ওকায, মাজান্নাহ ও যুল মাজায নামে তিনটি বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজের সময় সাহাবীরা সেই বাজারগুলোতে ব্যবসা করা গুনাহ বলে মনে করতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। অর্থাৎ হজের মৌসুমে সেসব স্থানগুলোতে ব্যবসা করা কোনো দোষের কাজ নয়। [বুখারী: ১৭৭০, ২০৯৮]

(৪) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীলকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরণ করে তাকে হজ করান। তারা আরাফাতে পৌঁছলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, عَرَفْتُ বা আমি চিনতে পেরেছি। কারণ, জিবরীল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এর পূর্বেই সেখানে একবার নিয়ে এসেছিলেন। আর সে জন্যই সেটার নাম হয় 'আরাফাত'। [ইবনে কাসীর]

هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

আসবে[১] তখন মাশ'আরুল হারামের[২] কাছে পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে[৩] তোমরা বিভ্রান্ত দের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে[৪]। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১) আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর আদ-দীলী বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হজ হচ্ছে আরাফাত। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বেই আরাফায় আসতে সক্ষম হবে সে হজ পেল। আর মিনা হচ্ছে তিন দিন। সুতরাং যদি কেউ দুইদিনে তাড়াতাড়ি করলো তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করলো তারও কোনো পাপ নেই।' [আবু দাউদ: ১৯৪৯, তিরমিযী: ৮৮৯, ইবনে মাজাহ: ৩০১৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩০৯,৩১০]

(২) এখানে 'মাশ'আরুল হারাম' বলে মুযদালিফা বোঝানো হয়েছে। কারণ, এ অংশ হারাম এলাকার ভিতরে। [ইবনে কাসীর]

(৩) এখানে 'এর আগে' বলে 'হেদায়াত আসার পূর্বে' বা 'কুরআনের পূর্বে' অথবা 'রাসূল আসার পূর্বে' এ তিনটি অর্থই হতে পারে। অর্থগুলো পরস্পর কাছাকাছি। [ইবনে কাসীর]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং উরনা উপত্যকা থেকে বের হয়ে যাও। আর মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানস্থল এবং আর তোমরা ওয়াদী মুহাস্‌সার থেকে প্রস্থান করো। আর মক্কার প্রতিটি অলিগলিই যবেহ করার জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিনই যবেহ করা যাবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮২] অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'কুরাইশ ও তাদের মতানুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে 'হুমুস' নামে অভিহিত করতো। আর বাকী সব আরবরা আরাফায় অবস্থান করতো। অতঃপর যখন ইসলাম আসলো তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আরাফাতে যেতে, সেখানে অবস্থান করতে এবং সেখান থেকেই প্রস্থান করতে নির্দেশ দান করেন। এ জন্যই এ আয়াতে মানুষের সাথে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ৪৫২০, মুসলিম: ১২১৯]

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চেয়েও অধিক(১)। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিন'। আখেরাতে তার জন্য কোনও অংশ নেই।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন(২)।'

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن

২০৩. আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। অতঃপর

(১) আতা বলেন, এর অর্থ হলো, শিশুরা যেমন পিতা মাতাকে সব সময় স্মরণ করে, তোমরাও হজ শেষ করার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে তেমনি স্মরণ কর। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জাহেলিয়াতে হজের সময় একত্রে বসে পরস্পরে বলাবলি করত যে, আমার পিতা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের ভালো কাজ করে দিতেন। তিনি মানুষের দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করে দিতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে আল্লাহ্‌র যিকরকে তাদের পিতৃপুরুষের স্মরণের সাথে তুলনা করে বেশী বেশী করে যিকর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। [ইবনে কাসীর]

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বার দুই রুকনের মাঝখানে এ দো'আ বলতে শুনেছি'। [আবুদাউদ: ১৮৯২] আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ দো'আ করতেন।' [বুখারী: ৪৫২২, মুসলিম: ২৬৯০]

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে[১] যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ ফাসাদ ভালবাসেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে, কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিকিয়ে

(১) আয়াতের এ অংশের তিনটি অর্থ হতে পারেঃ (১) পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। (২) পার্থিব জীবনে যাদের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। এবং (৩) পার্থিব জীবনে আপনি চমৎকৃত হন তাদের কথাবার্তায়।

দেয়(১)। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

২০৮. হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَإِن زَلَلۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٠٩

২০৯. অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ٢١٠

২১০. তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন(২)? এবং সবকিছুর মীমাংসা

(১) বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তার তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, - হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু'আনহু নিরাপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বললেন, সুহাইব লাভবান হয়েছে! সুহাইব লাভবান হয়েছে! [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৩৯৮]

(২) আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন

হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১১. ইস্‌রাঈল-বংশধরগণকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি! আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১২. যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক্ দান করেন।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ فَبَعَثَ ٱللَّهُ

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত(১)।

ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আগমন সত্য ও সঠিক। এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা আমরা জানি না।

(১) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিঃসন্দেহে তাওহীদের উপর ছিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আদম ও নূহ ‘আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম গত হয়েছেন, যারা সবাই তাওহীদের উপর ছিলেন। অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আদম ও নূহ ‘আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম হিদায়াতের উপর ছিল। [তাফসীরে তাবারী] অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা সত্য ও সঠিক মতকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। নবীগণের চেষ্টা পরিশ্রমের ফলে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন(১) যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু

পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত।

এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, দ্বীনের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলিম ও অমুসলিম দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ﴿فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ [সূরা আত-তাগাবুনঃ ২] আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে এ কথাও পরিস্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। বরং একক বিশ্বাস ও একক দ্বীনের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছে যে, ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্য দ্বীনের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা একক জাতীয়তা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে এবং বিচ্ছিন্ন জাতীয়তা গঠন করেছে।

(১) আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল বলেই আরও নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাযত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য দ্বীনে অটল থেকে মুসলিমদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তার পরে নবুওয়াত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুওয়াত ঘোষণা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল(১)। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে(২) অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ

(১) অর্থাৎ মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণ এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচারণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহ্‌গণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না। তবে কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চস্তরের বর্ণনা - যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪০২৩]

বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে[১]?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۬ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫. তারা কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে[২]। বলুন, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬. তোমাদের উপর লড়াই করাকে লিখে দেয়া হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস

(১) নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয়। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি আসুক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়াতের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

(২) অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই দানের পাত্র কারা? প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে, 'তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণ'। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন'। বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদেরকে ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না[১]।

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে[২]; বলুন, 'এতে যুদ্ধ করা কঠিন অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও এর বাসিন্দাকে এ থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তারচেয়েও বেশী অপরাধ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

(১) আয়াতের মর্ম হলো, "যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। তাই বলা হয়েছেঃ জিহাদ যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) আলোচ্য আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্‌ক্বদ, যিল্‌হজ এবং মুহার্‌রাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। প্রখ্যাত মুফাসসির 'আতা ইবনে আবী রাবাহ্' শপথ করে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কুরতুবী বলেন, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমন করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক পাল্টা আক্রমণ করা মুসলিমদের জন্যও জায়েয। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪২৩]

করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে[১] এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে[২], তারাই আল্লাহ্‌র

(১) মুরতাদ সে ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে গেছে, চাই তা কথায় হোক, বিশ্বাসে হোক বা কাজে হোক। এ আয়াতের শেষে মুসলিম হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে গেছে"। এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটআত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন সালাত-সাওম যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। আর আখেরাতে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'ইবাদাতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

(২) জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো: চেষ্টা করা, সাধনা করা, তা কাজ অথবা কথা যেকোন মাধ্যমে হতে পারে। শর'য়ী পরিভাষায় - কাফের, সীমালংঘনকারী অথবা মুরতাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনায় জিহাদের অসাধারণ ফযীলতের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জিহাদকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে

নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য"। [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১১] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সকল কিছুর মূল হলো ইসলাম। যার খুঁটি হলো সালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ'। [তিরমিযীঃ ২৬১৬] জিহাদের তুলনা অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের পরিপূরক হতে পারে'। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ 'আমি পাইনি'। [বুখারীঃ ২৮১৮] এছাড়া আল্লাহ্‌র পথে যারা জিহাদ করবে, তাদেরও অসংখ্য মর্যাদার কথা ঘোষিত রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। যেমন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ "আর আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারীরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সম্মানীত মেহমান। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'শহীদদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে - (১) রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেয়া হয়। (৩) কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং মহা শংকার দিনে শংকামুক্ত থাকবে। (৪) তাকে ঈমানের অলংকার পরানো হবে। (৫) জান্নাতের হূর তাকে বিয়ে করানো হবে। (৬) তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ দেয়া হবে'। [বুখারীঃ ২৭৯০]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সব সময়ই জিহাদ ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে-'আইনরূপে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলিমদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলিমই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলিমই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমাকে প্রেরণের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে, আমার উম্মতের সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে' [আবু দাউদঃ ২৫৩২] কুরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

ও মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৯৫] সুতরাং যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো, তবে তা বর্জনকারীদের সুফল দানের কথা বলা হত না। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেনঃ 'তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর'। [মুসলিমঃ ২৫৪৯] এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কেফায়া। যখন মুসলিমদের একটি দল ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলিম অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলিমদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের এরশাদ হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়"। [সূরা আত্-তাওবাঃ ৩৮] এ আয়াতে আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলিম দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পাশ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের উপর এ ফরয পরিব্যপ্ত হয় এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কেফায়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

২১৯. লোকেরা আপনাকে মদ[১] | يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ

(১) ইসলামের প্রথম যুগের জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মধ্যে মদ্যপান স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পরও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যারা হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও মদ্যপান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি। মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমর, মু'আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ 'মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। [আবু দাউদঃ ৩৬৭০, তিরমিযীঃ ৩০৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৫৩] এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলিমদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নাযিল হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। [মা'আরিফুল কুরআন]

এ আয়াতে পরিস্কারভাবে মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্য পানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে

ও জুয়া[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। | اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثۡمُهُمَآ اَكۡبَرُ

স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেত্‌নায় পড়তে না হয়, সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সূরার আন-নিসা এর ৪৩ নং আয়াতে মদপানের সময় সীমিত করা হয়। সবশেষে সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতের মাধ্যমে মদকে চিরতরে হারাম করা হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতে করা হবে।

(১) আয়াতে উল্লেখিত ميسر শব্দটির অর্থ বন্টন করা, ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হত। কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হত। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হত, আর গোশ্‌ত দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হত; নিজেরা ব্যবহার করত না। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হত। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হত। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হত। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৪২-৪৪৩] সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তার তাফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহকামুল-কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাস্‌সিরে কুরআন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, কাতাদাহ্, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ্, আতা ও তাউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেছেনঃ সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও। ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত। জাস্‌সাস ও ইবনে সিরীন বলেছেনঃ 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও 'মাইসির' এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, লটারীর মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় অপরদিকে অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, 'মাইসির' ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। [ইবনে কাসীর] এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজী ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বারীদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হাত রঞ্জিত করে'। [মুসলিমঃ ২২৬০]

مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۙ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ﴿٢١٩﴾

বলুন, 'দু'টোর মধ্যেই আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; আর এ দু'টোর পাপ উপকারের চাইতে অনেক বড়'। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত[১]। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۗ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া এবং আখেরাতের ব্যাপারে। আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম'। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী[২]। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর। এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়।

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, যখন "তোমরা উত্তম পদ্ধতি ব্যতীত ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না" [সূরা আল-আন'আম: ১৫২, আল-ইসরা: ৩৪] নাযিল হল তখন অনেকেই ইয়াতিমদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে ইয়াতিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতিমদের সাথে কিভাবে চলতে হবে তা জানিয়ে দেন।" [আবুদাউদ: ২৮৭১]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا

২২১. আর মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না(১)।

(১) আয়াতে মুশরিক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা হয়েছে, "তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৫]। তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐ সব বিশেষ অমুসলিমকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলিম পুরুষদের সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। মুসলিম বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার দ্বীনী ব্যাপারে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন দ্বীনহীন মুসলিম মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে অমুসলিম মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু যখন খবর পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলিমদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা দ্বীনী জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৫৬]

বর্তমান যুগের অমুসলিম আহলে কিতাব, ইয়াহূদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলিম সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলিমদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। ইসলামের খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু-এর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইয়াহূদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে দ্বীনী দিক থেকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত দ্বীনের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, নাসারা ও ইয়াহূদী মতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণভাবেই দ্বীন বর্জনকারী। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেও মানে না, তাওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, আখেরাতও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণই হারাম। সূরা আল-মায়েদাহ এর আয়াতে যাদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আজকালকার

الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, অবশ্যই মুমিন কৃতদাসী তার চেয়ে উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না[১], মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও অবশ্যই মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন[২]। আর

ইয়াহূদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলিমদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিম মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় দ্বীনের আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন মুসলিম অমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু কোন অমুসলিমের সাথে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাবারী] যুহরী, কাতাদাহ বলেন, কোন অমুসলিম চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাসারা বা মুশরিক তার কাছে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক] এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলিম নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শির্কের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা শিক্ষা নিতে পারে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۙ فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'তা অশুচি'(১)। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত(২) (সংগমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না(৩)। তারপর তারা

হয় অথবা কুফর ও শির্কের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শির্কে জড়িয়ে পড়ে; যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহ্বান করেন এবং পরিস্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আয়াতে বর্ণিত مَحِيضٌ অর্থ দু'টি। ১. হায়েযের স্থান ২. হায়েযের সময়। অর্থাৎ তারা আপনাকে হায়েয এর ব্যাপারে অথবা হায়েযের স্থান অথবা হায়েযের সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তারা হায়েযের সময়ে সে স্থানে কি করতে পারে, আর কি করতে পারবে না এ প্রশ্ন করছে। বলুন যে, সেটা أذى - এর এক অর্থ, কষ্ট। আরেক অর্থ, অপবিত্রতা, অশুচি। দু'টি অর্থই শুদ্ধ। [তাফসীরে কুরতুবী] হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কতটুকু মেলামেশা করা যাবে, তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হায়েযের স্থানে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই করতে পার"। [মুসলিম: ৩০২] উম্মুল মুমিনীন মায়মূনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হায়েয অবস্থায় কোন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চাইতেন তখন তাকে হায়েযের স্থানে কাপড় পরিধান করে নিতে বলতেন।" [বুখারী: ৩০৩, মুসলিম: ২৯৪]

(২) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব। তার সাথে সাথে কিছু দান-সদকা করে দিলে তা উত্তম। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/১৭১, ১৭২, তিরমিযী: ১৩৭] তবে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় সংগম ক্রিয়া ব্যতীত তাদের সাথে সর্বপ্রকার মেলামেশাই জায়েয। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অংশে মেলামেশা জায়েয।

যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং তাদেরকেও ভালবাসেন যারা পবিত্র থাকে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে[১] গমন করতে পার। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো[২] এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র সম্মুখীন হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর তোমরা সৎকাজ এবং তাকওয়া ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্র নামের শপথকে অজুহাত করো না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[৩]।

---

(১) আল্লাহ্ এখানে স্ত্রীদের সাথে সংগমের কোন নিয়মনীতি বেঁধে দেননি। শুইয়ে, বসিয়ে, কাত করে সব রকমই জায়েয। তবে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ যেমন, পায়ূপথ, মুখ ইত্যাদিতে সংগম করা জায়েয নেই। কেননা, তা বিকৃত মানসিকতার ফল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে নিষেধ এসেছে।

(২) এখানে 'ভবিষ্যতের জন্য কিছু কর' বলতে অনেকের মতেই সন্তান-সন্ততির জন্য প্রচেষ্টা চালানো বুঝানো হয়েছে।

(৩) মুমিনদের জন্য কখনো ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে শপথ করা উচিত হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি যখনই কোন কাজের শপথ করি, তারপর তারচেয়ে ভাল কাজ শপথের বিপরীতে দেখতে পাই, তখনি আমি সে শপথ ভেঙ্গে যা ভাল সেটা করি এবং পূর্বকৃত শপথের কাফ্ফারা দেই'। [বুখারীঃ ৩১৩৩, মুসলিমঃ ১৬৪৯]

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. তোমাদের অনর্থক শপথের(১) জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি সেসব কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তর যা সংকল্প করে অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহিষ্ণু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যারা নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে(২) তারা চার মাস অপেক্ষা

(১) 'ইয়ামীনে লাগও' বা 'অনর্থক-কসম'- এর এক অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে শপথ শব্দ বেরিয়ে পড়া। [বুখারী:৪৬১৩] কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলে মনে করেই শপথ করা। উদাহরণতঃ - নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। [কুরতুবী:৪/১৭] এ ধরনের শপথে কোন পাপ হবে না। আর সেজন্যই একে অহেতুক বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং এ ধরণের কসমের কোন কাফ্ফারাও নেই। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গামুস'। এতে পাপ হয়। এ আয়াতে দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও এক প্রকারের কসম আছে, যাকে বলা হয় 'মুন'আকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে এক্ষেত্রে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে। [কুরতুবী: ৪/১৯] সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৮৯ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে, প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করল না। দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল। তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করল। চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিকগুলোকে শরী'আতে 'ঈলা' বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাত'য়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ পুনঃর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব

করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তারা তালাক(১) দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨﴾

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ(২) তিন

হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) ইসলামী শরী'আতে বিয়ে হচ্ছে, পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তিস্বরূপ। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি 'ইবাদাত। সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির ঊর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না। আর তালাক; তা বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরী'আত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(২) ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিশ সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এজন্যই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা

রাখা হয়েছে। ইসলামী শরী'আত অন্যান্য দ্বীনের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু আদাব ও শর্ত রয়েছে। যেমন, এক. এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। দুই. রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। তিন. ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে চল্তি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চল্তি ঋতুর শেষে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। চার. পবিত্র অবস্থায়ও যে তুহুর বা সুচিতায় সহবাস হয়েছে তাতে তালাক না দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কারণ, যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ. বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। ছয়. যদি পরিস্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। সাত. প্রত্যাহারের এ অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক বা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আট. যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে(১)। আর

(১) আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরী'আতী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছেঃ "যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৩৪] ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুস্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। মীরাসের অধিকারিনী হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি পিতা হলেও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। স্বামী

আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২৯. তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয়(১)। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

তার নায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। আবার ইসলাম নারীদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেও দেয়নি; কারণ তা নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। এ আয়াতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপরই হয়ে থাকে। তাই আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) অর্থাৎ 'তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মাহ্র ফেরত নেয়া হালাল নয়'। কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মাহ্র মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কুরআনুল কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে।

সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই(১)। এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

২৩০. অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে(২)। অতঃপর সে

(১) অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মাহ্‌র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মাহ্‌র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত যে, সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবেত ইবনে কাইসের দ্বীনদারী এবং চরিত্রের উপর আমার কোন অভিযোগ নেই; কিন্তু আমি মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা মোটেও পছন্দ করি না। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে অমিল ছিল) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তাকে (স্বামীকে)-মাহ্‌র হিসেবে তোমাকে যে বাগান দিয়েছিল-তা ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললেন, বাগানটি ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও'। [বুখারীঃ ৫২৭৩]

(২) অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি

(দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর | حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا

এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যু বরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তালাক দেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিঃ কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। [ইবনে আবী শাইবাহ্ঃ ১৭/৭৪৩] ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে ইবরাহীম নাখ্'য়ী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা: ইসলামী শরী'আত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরী'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরও সুবিধা হচ্ছে এই যে, এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরও এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরী'আতও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয়পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না[১]। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা 'ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দেবে, অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে[২]।

(১) এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। তা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এ ধরণের বিয়ে মোটেই হালাল বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এ ধরণের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। আলী, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখ সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক যোগে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করে তাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪৮, আবু দাউদঃ ২০৬২, তিরমিযীঃ ১১১৯, ১১২০]

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য এ আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা হয়েছে ﴿تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾ এখানে تَسْرِيْحٌ -অর্থ

نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু করো না[১] এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও কিতাব এবং হেকমত যা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। تَسْرِيْحٌ এর সাথে إِحْسَانٍ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলা ও তামাশায় পরিণত করো না। অর্থাৎ বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দিয়ে দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়্যতের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে, দ্বিতীয়টি তালাক এবং তৃতীয়টি রাজ'আত বা তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা'। [আবু দাউদঃ ২১৯৪, তিরমিযীঃ ১১৮৪, ইবনে মাজাহঃ ২০৩৯]

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়(১), তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হয়(২) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও

(১) এখানে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধা সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরী'আত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে "উভয়ে শরী'আতের নিয়মানুযায়ী রাযী হবে"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাযী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাযীও হয় আর তা শরী'আতের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই কোন নারী অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলিম তথা বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তারা সবাই এমন কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য এসব আহ্কাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

পবিত্রতম(১)। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا

২৩৩. আর জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে(২), এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণ করা(৩)। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কাজের

(১) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এ বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

(২) এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান ও দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও যুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ "মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করাবে"। এখানে এটা স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এ দু'বছরের পর শিশুকে আর মাতৃস্তন্যের দুধ পান করানো চলবে না।

(৩) এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। [কুরতুবী]

فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ভার দেয়া হয় না। কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য[১] এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। আর যদি তোমরা (কোন ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা (স্ত্রীগণ) নিজেরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন।

(১) এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫. আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক দাও তবে তোমাদের কোন অপরাধ নেই[১]। আর তোমরা তাদের কিছু সংস্থান করে দেবে, সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমত সংস্থান করবে, এটা মুহসিন লোকদের উপর কর্তব্য।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

২৩৭. আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ

(১) অর্থাৎ এ অবস্থায় তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। যদিও এতে স্ত্রীদের মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের কিছুই থাকে না। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু উপভোগ্য জিনিস প্রদান করে সেটার সমাধান করতে পার। আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, এমতাবস্থায় তোমাদের উপর (মোহরের) কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

তাদের জন্য মাহ্র ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক(১), তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়(২) এবং মাফ করে দেয়াই

(১) মাহ্র ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে, যদি মাহ্র ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মাহ্র ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মাহ্র ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থতঃ মাহ্র ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মাহ্র পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতদ্বয়ে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ নং আয়াতে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে,মাহ্র কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কুরআনুল কারীম প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এমনি এক ব্যাপারে দশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্ পাঁচশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মাহ্র বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মাহ্রের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মাহ্রই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

(২) "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে"-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ দু'টি মতে বিভক্ত - (১) একদল আলেম বলেনঃ এখানে "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে" বলতে স্ত্রীর অভিভাবককে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মত একদিকে শক্তিশালী, অপরদিকে দূর্বল, শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, ক্ষমা করাটা মূলতঃ স্ত্রীর অভিভাবকের পক্ষেই মানানসই। অপরদিকে দূর্বল হলো এ দিক থেকে যে, সত্যিকারভাবে বিয়ের বন্ধন স্বামীর হাতেই। স্ত্রীর অভিভাবকের এখানে কোন হাত নেই। (২) আরেক দল আলেম বলেনঃ এখানে যার হাতে বিয়ের বন্ধন বলতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ

তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে[১], বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের[২] এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে;

সনদে বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীনদের থেকে বর্ণনা এসেছে। [দারা কুতনী: ৩/২৭৯] এ মতও একদিক থেকে শক্তিশালী, অপরদিক থেকে দূর্বল। শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, মূলতঃ যার হাতে বিয়ের বন্ধন, সে হলো স্বামী। আর দূর্বল হলো এদিক থেকে যে, যদি স্বামী উদ্দেশ্য হয় তবে ক্ষমা কিভাবে করা হবে? মাহ্র দেয়া তো তার উপর ওয়াজিব। সে কিভাবে ক্ষমা করতে পারে? তবে ইবন জারীর রাহিমাহুল্লাহ্ এ মতের সমর্থন করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে - ক) স্বামীর হাতেই মূলতঃ বিয়ের বন্ধন। স্ত্রীর অভিভাবকের হাতে নেই। খ) স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমার অর্থ হলো এই যে, তারা পূর্বকালে পূর্ণ মাহ্র আদায় করেই বিয়ে করত, তারপর বিয়ে ভঙ্গ হলে স্বামী বাকী অর্ধেক মাহ্র ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাতো।

(১) সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয় বর্ণনা করার পর সালাতের তাকীদ দিয়ে আল্লাহ্ এ ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ, সালাত এমন একটি জিনিষ যা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে আর এ সঙ্গে তাকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারত না।

(২) কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী সালাতের অর্থ হচ্ছে আসরের সালাত। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি সালাত - ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি সালাত - মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ সালাতের জন্য তাকীদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মের ব্যস্ততা থাকে। আসরের সালাতের গুরুত্ব বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গেল'। [বুখারীঃ ৫৫২] আর হাদীসে 'কানেতীন' বা 'বিনীতভাবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে নীরবতার সাথে। [বুখারীঃ ১২০০]

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. অতঃপর যদি তোমরা বিপদাশংকা কর, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে(১)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়াত করে(২)। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(১) সালেহ্ বিন খাওয়াত ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ (সাহাবাগণের) একদল সালাত আদায়ের জন্য তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেক দল শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাকা'আত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ একা একা দ্বিতীয় রাকা'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট (এক) রাকা'আত আদায় করে বসে থাকলেন। (দ্বিতীয় দলের) মুক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাকা'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে সালাম ফিরালেন। [বুখারীঃ ৪১২৯]

(২) স্বামীর মৃত্যুর দরুন স্ত্রীর ইদ্দতকাল ছিল এক বছর। কিন্তু পরবর্তীতে এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে বছরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, এ আয়াতটি এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য(১)।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪২. এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۭ اِنَّ

২৪৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল(২)?

(১) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মাহ্র ধার্য করা হয়েছে, তাদের 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার এক অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্র দিয়ে দেয়া। আর যার মাহ্র ধার্য করা হয়নি, তার জন্য মাহরে-মিসাল দেয়া। আর যদি 'মাতা' শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে কিছু কাপড় বা আর্থিক দান বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রথমোক্ত মহিলা যার সাথে স্বামীর সহবাসও হয়নি আর তার মাহ্রও নির্ধারিত হয়নি। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মুস্তাহাব। আর যদি 'মাতা'' শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব। তালাকে-রাজ'য়ীই হোক আর তালাকে বায়েনই হোক, ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, কোন এক শহরে ইসরাঈল-বংশধরের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে দু'জন ফেরেশ্তা পাঠালেন তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। ফেরেশ্তা দু'জন ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল। দীর্ঘকাল পর ইসরাঈল-বংশধরদের একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা

اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা মরে যাও'। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না[১]।

অবগত করানো হল। তখন তিনি দো'আ করলেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। [ইবনে কাসীর]

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক বা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তি বা তাকদীরের প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ।

(১) এ আয়াত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ বা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না'। [বুখারীঃ ৩৪৭৩, মুসলিমঃ ২২১৮] ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়'। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি

তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়ত সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়ত এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হত না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকত, তার মৃত্যু এ সময়েই হত। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে। যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয়তঃ এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তাকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর। এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিতঃ একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের কি অবস্থা হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত, তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মরে গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে? দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়ত রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর থেকে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। কারণ প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা তা সবারই জানা। তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়ত নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বনের বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে নাযিল হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হত তাদের ভেতর পাঠানো হত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহ্‌কে কর্‌যে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন(১)। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۭ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۗىِٕنَا ۭ

২৪৬. আপনি কি মূসার পরবর্তী ইস্‌রাঈল-বংশীয় নেতাদের দেখেননি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি', তিনি বললেন, 'এমন

তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে'। [বুখারীঃ ৫৭৩৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'। [বুখারীঃ ৫৭৩২] এর ব্যাখ্যাও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) কর্জ বা ঋণ দান করলে তার বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, 'যে ব্যক্তি তার উত্তম সম্পদ থেকে খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে, আল্লাহ্ উত্তম সম্পদ ছাড়া কবূল করেন না, আল্লাহ্ সে সম্পদ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন, যেমনি তোমাদের কেউ তার ঘোড়া শাবককে লালন-পালন করে পাহাড়সম বড় হওয়া পর্যন্ত। [বুখারীঃ ১৪১০] আল্লাহ্‌কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদ্‌কা করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ২৪৩০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে'। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে'। [বুখারীঃ ২৬০৬]

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা যখন নিজেদের আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিস্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করবো না'? অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন'। তারা বলল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশী হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেয়া হয়নি!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন'। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত[১] আসবে

(১) বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালূত ইসরাঈল-বংশধরদেরকে

যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে'।

اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢٤٨

২৪৯. তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হলো তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পানি পান করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা তা থেকে পানি পান করল(১)। সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝٢٤٩

পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশ্তাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। ইসরাঈল-বংশধররা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। [তাফসীরে বাগভী: ১/২৩০, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয: ১/৩৩৩]

(১) কোন কোন তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে তিন ধরণের লোক ছিল। একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার কথাও চিন্তা করেননি। [মা'আরিফুল কুরআন]

বলল, 'জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে'! আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

২৫০. আর তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন'।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫২. এ সব আল্লাহর আয়াত, আমরা আপনার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। আর নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩. সে রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন(১), আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর মার্ইয়াম-পুত্র ‘ঈসাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি ও রুহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তারা মতভেদ করলো। ফলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কেউ কুফরী করল। আর

(১) ‘কথা বলা’ আল্লাহ্ তা‘আলার একটি গুণ। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা শ্রুত বাক্য দ্বারা কথা বলেন। কথা বলার এ গুণটির উপর কুরআন ও সুন্নাহ্র বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ “এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন”। [সূরা আন্-নিসাঃ ১৬৪] আল্লাহ্ আরও বলেনঃ “আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন মূসা বললেনঃ হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব”। [সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৪৩] আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আদম ও মূসা বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। মূসা আদমকে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে নিরাশ করে আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আদম তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ আপনাকে কথপোকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং নিজ হস্তে আপনাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন.....। [বুখারীঃ ৬৬১৪, মুসলিমঃ ২৬৫২] তবে মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশ্তাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বললেও তা অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়) আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পর কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরা আশ্-শুরার সে আয়াতটি দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমরা যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ

২৫৫. আল্লাহ্[১], তিনি ছাড়া কোন সত্য

(১) এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটি মর্যাদার দিক থেকে কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হোক'। [মুসলিমঃ ৮১০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না'। [নাসায়ী, দিন-রাতের আমলঃ ১০০] অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে। অনেকেই এ সূরার আয়াতুল কুর্সীতে "ইসমে 'আযম" আছে বলে মত দিয়েছেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতে মহান রব আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাতে কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে

ইলাহ্ নেই(১)। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক(২)। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়(৩)।

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

(১) প্রথম বাক্য ﴿اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা 'ইবাদাতের যোগ্য। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্তা-ই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনিই একমাত্র হক মা'বুদ। আর সবই বাতিল উপাস্য।

(২) দ্বিতীয় বাক্য ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ আরবী ভাষায় حَيٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّوم শব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়্যূম' আল্লাহ্র এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়্যূম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আব্দুল কাইয়্যূম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়্যূম' বলে, তারা গোনাহ্গার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্র এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহ্র বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহ্মান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহ্হাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহ্র নামের মধ্যে ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'।

(৩) তৃতীয় বাক্য ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ আরবীতে سِنَةٌ শব্দের সীন-এর كسرة দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نوم পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যূম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করেছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার ঊর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই।

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর(১)। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে(২)? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন(৩)। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা

আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

(১) চতুর্থ বাক্য ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لام অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

(২) পঞ্চম বাক্য ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব'। [মুসলিমঃ ১৯৩] একে 'মাকামে-মাহ্‌মুদ' বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

(৩) ষষ্ঠ বাক্য ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অগ্র-পশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বের ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অপ্রকাশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দু'টিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয়দিকই বোঝানো হয়।

পরিবেষ্টন করতে পারে না[১]। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে[২]; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না[৩]। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান[৪]।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

২৫৬. দ্বীনগ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৫]; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ

(১) সপ্তম বাক্য ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

(২) অষ্টম বাক্য ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব'। [ইবন হিব্বান: ৩৬১; বায়হাকী: ৪০৫]

(৩) নবম বাক্য ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

(৪) দশম বাক্য ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(৫) কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীন গ্রহণে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ দ্বীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ | থেকে। অতএব, যে তাগূতকে[১] অস্বীকার

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধ ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ "তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না"। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪] এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ আয়াতের পরিপন্থী নয়। আবার কোন কোন নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা - "দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই" -এ অংশটুকু বলে। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে, তারা ইসলামের প্রতিটি আইন ও যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম মানতে বাধ্য। সেখানে শুধু জোর-যবরদস্তি নয়, উপরন্তু শরী'আত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানো অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। যেমনটি সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

(১) 'তাগূত' শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে 'ইবাদাতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহ্বান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম: ই'লামুল মু'আক্কে'য়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগূত এমন বান্দাকে

বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ্ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহ্র মোকাবেলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় 'ফাসেকী'। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহ্র শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় 'কুফরী ও শির্ক'। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগূত।

এ ধরণের তাগূত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগূত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন। (এক) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র 'ইবাদাত থেকে বিরত রেখে তার 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগূত। (দুই) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ। (তিন) যে আল্লাহ্র বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহ্র বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহ্র বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে। (চার) যার 'ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। (পাঁচ) যে মানুষদেরকে নিজের 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগূতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগূত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগূতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব। (১) আল্লাহ্র রুবুবিয়্যত তথা প্রভূত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা। (২) আল্লাহ্র উলুহিয়্যাত বা আল্লাহ্র 'ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণঃ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণঃ, হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগূত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্কে 'ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগূত। এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ্, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহ্বান জানায়।

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

করবে(১) ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না(২)। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়(৩)। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ

২৫৮. আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইব্‌রাহীমের সাথে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্

(১) তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগূত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগূতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য 'ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার 'ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

(২) ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।

(৩) এখানে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তাকে রাজত্ব[১] দিয়েছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বললেন, ‘ আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান’, সে বলল, ‘আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই’। ইব্‌রাহীম বললেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো[২]। তারপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى

২৫৯. অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, ‘মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন?’ তারপর আল্লাহ্ তাকে এক শত বছর মৃত

(১) এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন বোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

(২) কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়ত বলতে পারত যে, যদি আল্লাহ্ বলে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্বদিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ এ মু‘জিযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরই দেয় নি। অথবা তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই ছিল না। এ জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। [বয়ানুল কুরআন]

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি'। তিনি বললেন, বরং তুমি এক শত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে। আর যাতে আমরা তোমাকে বানাবো মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ্য কর; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই'। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলল, 'আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. আর যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান', তিনি বললেন, 'তবে কি আপনি ঈমান আনেন নি?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়(১)!'

(১) আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেনঃ আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেনঃ 'এরূপ আকাংখা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি আপনার আস্থা নেই?' ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেনঃ আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে

আল্লাহ্ বললেন, 'তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণঃ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হল, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্রই হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদেরকে ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে উড়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশ্ত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হল। [তাফসীরে কুরতুবীঃ ৪/৩১৪]

(১) পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ(১)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে(২) তারপর যা ব্যয় করে তা বলে

পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না করানোর মধ্যে 'ঈমান বিল-গায়েব' বা গায়েবের উপর ঈমান স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে।

(১) ২৬২ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে অগ্নিগিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত, এক. প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা, যাকে সাদাকাহ বলা হয়। দুই. সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। প্রথমে দান-সাদাকাহ্র ফযীলত, সেদিকে উৎসাহ দান এবং সে সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে সবশেষে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআনুল কারীম কোথাও إِنْفَاق শব্দে, কোথাও إِطْعَام শব্দে, কোথাও صَدَقَة শব্দে এবং কোথাও إِيْتَاءُ الزَّكَاة শব্দে ব্যক্ত করেছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, إِطْعَام - إِنْفَاق - صَدَقَة প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-সদকা ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কুরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ إيتاء الزكوة ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে বেশীর ভাগ إِنْفَاق শব্দ এবং কোথাও صَدَقَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর

لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৪. হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না[১] যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। ফলে তার উপমা হলো এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত সেটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়[২]। যা তারা

অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-সদকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে সদকা কবূল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

(২) এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়্যত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়্যতের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্টে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা

উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না[১]।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৬৫. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেথায় ফলমূল জন্মে দ্বিগুন। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী[২]।

যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়্যতের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়্যত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১) এখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবূল করতে পারে না।

(২) এ আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-সদকার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই পরিজ্ঞাত। এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়্যত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎনিয়্যত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং আখেরাতের সাফল্যের কারণ।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং যেটাতে তার জন্য সবরকমের ফলমূল থাকবে। আর সে ব্যক্তিকে বার্ধক্য অবস্থা পেয়ে বসবে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে, তারপর তার (এ বাগানের) উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়ে তা জ্বলে যাবে? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার[১]।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে-সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শষ্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তেই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

২৬৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর(১) এবং আমরা যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি(২) তা

কথা। একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কি জান এই আয়াতটি কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে -"তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর যে, তার একটি বাগান হবে"। [সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬] এ কথা শুনে তারা বললেনঃ আল্লাহ্ই সবচাইতে ভাল জানেন। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রেগে গিয়ে বললেনঃ বরং (পরিস্কার করে) জানি অথবা জানিনা বলুন। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আমার মনে একটি কথা জাগতেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আমার ভাতিজা, বল, এবং তুমি তোমাকে ছোট মনে করো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ এখানে আল্লাহ্ আমলের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ কোন উদাহরণ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ শুধুমাত্র আমলের উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ মেনে আমল করছে; অতঃপর আল্লাহ্ তার নিকট শয়তানকে প্রেরণ করলেন। তখন শয়তানের নির্দেশে নাফরমানী করতে লাগল। এমনকি তার সমস্ত নেক আমলকে সে বরবাদ করে ফেলল। [বুখারী ঃ ৪৫৩৮]

সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও দান-সদকা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ্ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে,তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্টতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়্যতের সাথে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথেই করতে হবে - নাম-যশের জন্য নয়। অর্থাৎ ব্যয় করতে হবে ইখলাসের সাথে।

(১) এ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর'। [আবু দাউদঃ ৩৫২৮, ৩৫২৯, ইবনে মাজাহ্ঃ ২১৩৮]

(২) أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে জমিনের উৎপন্ন শষ্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। 'ওশর' ও 'খারাজ' ইসলামী

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয়[১] এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়,

শরী'আতের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক 'ইবাদাতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন - যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-'আরদ' বা 'ভূমির যাকাত'ও বলা হয়। পক্ষান্তরে 'খারাজ' শুধু করকে বোঝায়। এতে 'ইবাদাতের কোন দিক নেই। মুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়,তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য্য করা হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিতে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য দ্রব্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

(১) যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়্যত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

সর্বজ্ঞ(১)।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছে হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত(২) প্রদান

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ

(১) প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, - অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হল যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে। [দেখুন, বুখারীঃ ৪১, মুসলিমঃ ১২৮]
আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্ত আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না। এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না'। [মুসলিমঃ ১০১৫] (২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়্যতে কিংবা নাম-জশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকের মত, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। (৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

(২) 'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি।

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বিবেকসম্পন্নগণই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن

২৭০. আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর(১) অথবা যা কিছু তোমরা মানত(২) কর

হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুওয়াতের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুওয়াতকে বোঝানো হয়েছে। রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিস্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদানুযায়ী কর্ম। এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেয়া হয়েছে কুরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও দ্বীনের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। কেননা, আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ্ বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে উপরোল্লেখিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। [বাহরে মুহীত]

(১) 'যা কিছু তোমরা ব্যয় কর' বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। মানত বলতে বুঝায় - কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন কাজ করার শর্ত করা। যেমন, 'যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি হজ করব' বা 'যদি আমার ব্যবসায় সাফল্য আসে তবে আমি এত টাকা দান করব' ইত্যাদি। মূলতঃ মানত পূরণ করা 'ইবাদাত। কিন্তু মানত করা 'ইবাদাত নয়। মানত করার ব্যাপারে শরী'আত কাউকে উৎসাহ দেয়নি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মানত কারো জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসে না বরং মানত কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু বের করে'। [বুখারীঃ ৬৬০৮, ৬৬৯২, ৬৬৯৩] তাই মানত করার চেয়ে যে 'ইবাদাতের মানত করার ইচ্ছা করেছে, মানত না করে সে 'ইবাদাত পালন করে তার অসীলায় দো'আ করাই শরী'আত নির্দেশিত সঠিক পন্থা। এজন্য শরী'আতে মানত করা থেকে নিষেধ এসেছে। কিন্তু যদি কেউ মানত করে, তারপর যদি কাজটা সৎকাজ হয় তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব।

نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন(১)। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্মক অবহিত(২)।

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

২৭২. তাদের হিদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দেন। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য আর তোমরা তো

আর যদি অসৎকাজ হয় তাহলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন, কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হজ করার মানত করলে তাকে হজ করে মানত পূরণ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাযারে বা পীরকে কিছু দেয়ার মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা শির্ক।

(১) অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

(২) বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দ্বীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দ্বীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

শুধু আল্লাহ্‌কে[১] চেয়েই (তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই) ব্যয় করে থাক। আর তোমরা উত্তম কোন কিছু ব্যয় করলে তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৭৩. এগুলো অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না[২]; আত্মসম্মানবোধে না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে[৩]; আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন[৪]। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না[৫]। আর যে

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿وَجْهُ اللَّهِ﴾ অর্থ আল্লাহ্‌র চেহারা। কিন্তু এখানে এ শব্দ দ্বারা তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি যাতী গুণ। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল ও সত্তা দু'টোই সাব্যস্ত হবে।

(২) এখানে অভাবগ্রস্ত লোক বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনী কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

(৩) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও জায়েয হবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৪) এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খত্‌নাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলিমদের গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৫) এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না - এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তাফসীরকারক তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। বরং সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে ব্যাপারে সবিশেষ জ্ঞানী।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে[১], গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[২]।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا

২৭৫. যারা সুদ[৩] খায়[৪] তারা তার ন্যায়

(১) এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়্যতে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়্যত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দান-সদকা নির্ভুল ও সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

(৩) রিবা শব্দের অর্থ সুদ। 'রিবা' আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রিবা দু'প্রকারঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে। আর অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। প্রথম প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার 'রিবা'কে 'রিবাল ফাদল' বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার রিবাকে বলা হয়, 'রিবা-আন্-নাসিয়্যাহ।' এটি জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করত। এর সংজ্ঞা হচ্ছে, ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া। যাবতীয় 'রিবা'ই হারাম।

(৪) এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে(১)। এটা এ জন্য যে, তারা বলে(২), 'ক্রয়-বিক্রয় তো সূদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন(৩)। অতএব, যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং

বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ্ লিখেছেনঃ 'চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

(২) এ বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দু'টি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ 'ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত'। অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলত, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জবাবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? হালাল ও হারাম কি কখনো এক?

তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন(১)। আর আল্লাহ্ কোন অধিক কুফরকারী, পাপীকে ভালবাসেন না(২)।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান-সদকা উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়্যতও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-সদকাকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেনঃ এ মেটানো ও বাড়ানো আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ আখেরাতে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-সদকাকারীদের ধন-সম্পদ আখেরাতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তাফসীরকারগণ বলেনঃ সুদকে মেটানো এবং দান-সদকাকে বাড়ানো আখেরাতে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি আখেরাতের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিস্কার; সত্য উপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৫] এর উদ্দেশ্যও তাই।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না"। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার ও পাপাচারী। [মা'আরিফুল কুরআন]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও(১)। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই(২)। তোমরা যুলুম

(১) আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহ্‌র কারণে কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) বলা হয়েছে 'যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে'। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও ফেরত পাবে না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে - তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না[১]।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮০. আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ। আর যদি তোমরা সদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২], যদি

(১) এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিষের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিষের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর দুনিয়া ও আখেরাতের মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না। সুতরাং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার স্বীকার হতে হয়।

(২) এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরী'আতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

তোমরা জানতে[১]।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রনয়ণ করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারীম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও। হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহ্র সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৪৮০] অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ 'যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে। তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/২৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৬০]

এ আয়াত থেকে শরী'আতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালাত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে।

(১) সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয়। [ইমাম ত্বাবারী সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন] তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

২৮১. আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না[১]।

যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা‘নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ‘যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্‌র লা‘নত হোক। [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ২২৭৭] (২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, যিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা‘নত করেছেন’। [বুখারীঃ ৫৯৬২] (৩) সামূরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ্ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু’জন আগন্তুক (ফেরেশ্‌তা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন! আমি তাদের দু’জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাঁতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তূপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তূপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাঁতরাতে চলে যেত। সাঁতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। ....শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাঈল বললেনঃ আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দাকে নসীহত করে বলছেন যে, দুনিয়ার আবাস ক্ষণস্থায়ী। এখান থেকে খুব কম সময়ের পরই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখানকার যাবতীয় সম্পদ রেখেই সবাইকে খালি হাতে আমার সামনে আসতে হবে। সুতরাং সে দিনের ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা জরুরী যখন তোমরা আমার সামনে নীত হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্ম অনুসারে তোমাদেরকে শাস্তি বা পুরষ্কার

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো(১); তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে(২);

দেয়া হবে। সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে এর পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১ দিন জীবিত ছিলেন। [ইবনে কাসীর]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীম এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে "তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও"। এতে প্রথম নীতি এই যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত - যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফেকাহ্বিদগণ বলেছেনঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধান কাটার সময়'- এরূপ নির্ধাতির করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন এক পক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে - যাতে কারো মনে সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার

مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۚ وَلَا
يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ
فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

এবং যে ব্যক্তির উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[১] এবং সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[২]। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দুজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে

করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র।

(২) লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ বা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক ও অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআনুল কারীমের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়।

তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়[১]। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে[২]। আর তা (লেন-দেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে -যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরী'আতসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরী'আতসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না। আয়াতে এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে (২) সাক্ষী মুসলিম হতে হবে। ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য 'আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক - সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপার বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহযোগীতা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয় - বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার(১)। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে(২)। অতঃপর

(১) আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী দিতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়ত মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে, ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ﴾ অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্ হবে। এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্গণ বলেনঃ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের নায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়।

(২) এ আয়াত দ্বারা সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে মুকীম বা অবস্থানকালেও বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না(১)। আর যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী(২)। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন(৩)। অতঃপর যাকে

ওয়াসাল্লাম নিজেও মুকীম অবস্থায় বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকী) কিছু খাদ্য সামগ্রী খরিদ করেন এবং ঐ সময়ের জন্য তিনি ইয়াহূদীর নিকট তার বর্ম বন্ধক রাখেন। [বুখারীঃ ২৫০৯]

(১) সাক্ষ্য দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষ্যে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই সত্য গোপন করার আওতায় পড়ে।

(২) এ আয়াতে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে কেউ যদি বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। ‘অন্তর গোনাহ্গার’ বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম। [মা‘আরিফুল কুরআন]

(৩) আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের

ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন(১)। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٢٨٥

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ

২৮৬. আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত(২)। সে ভাল যা উপার্জন

হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কেয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেনঃ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে। [বুখারীঃ ২৪৪১, মুসলিমঃ ২৭৬৮]

(১) এটি আল্লাহ্র অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর উপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা

نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا
كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا
وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا
عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। 'হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর

গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন - মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমত কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মুসলিমদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাফযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪১২, ১/৩৩২; মুসলিমঃ ১২৫] তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে।

যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন[১]।

(১) আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট'। [বুখারীঃ ৪০০৮, ৫০০৮, মুসলিমঃ ৮০৮] অর্থাৎ বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট।